দাম : বারো টাকা

# স্বস্তিকা

৭২ বর্ষ, ৪ সংখ্যা।। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
২৯ ভাদ্র - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১
website : www.eswastika.com

নিহত তাপস বর্মন

## রক্তাক্ত দাড়িভিট
### ফিরে দেখা

নিহত
রাজেশ
সরকার

# স্বস্তিকা

*।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

৭২ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ২৯ ভাদ্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

১৬ সেপ্টেম্বর - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

**সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত**

**সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

**অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১**

**অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬**

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

**দাম : ১২ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।**

**Postal Registration No.**- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১


# সূচীপত্র


**সম্পাদকীয়** □ ৫

**কুনাট্য বামপন্থী রঙে, লোক মজেছে ভারত-বঙ্গে**
□ বিশ্বামিত্র □ ৬

**খোলা চিঠি : বামেরা ফিরছে বঙ্গে, দিল্লিতে**
□ সুন্দর মৌলিক □ ৭

**এক দেশ, এক সংবিধান— সত্যিই কি তাই?**
□ রবিন ডেভিড □ ৮

**নিম্নমেধার তৃণমূলি সংস্কৃতি সাফ হয়ে যাবে জাতীয়তাবাদী বঙ্গ রাজনীতির জোয়ারে** □ সুজিত রায় □ ১১

**স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বে এরাজ্যে প্রশাসন সন্ত্রস্ত**
□ বলাই চক্রবর্তী □ ১৩

**বিদ্যাসাগরের অমর অবদানের কিছু কথা**
□ ড. অনিল চন্দ্র দাস □ ১৫

**স্বামী বিবেকানন্দর পথে 'নতুন ভারত, বিজয়ী ভারত'**
□ তরুণ বিজয় □ ১৭

**একাত্তরের পর বাংলাদেশ থেকে নাকি ভারতে আসেনি**
□ সিতাংশু গুহ □ ১৮

**দাড়িভিটের বলিদান বাঙ্গালির ভাষা আন্দোলনের ক্রমিক প্রবাহ**
□ প্রবীর ভট্টাচার্য □ ২৩

**দাড়িভিটের স্ফুলিঙ্গ থেকে ভাষা আন্দোলনের প্রদীপ জাগাতে আমরা ব্যর্থ** □ ড. মোহিত রায় □ ২৬

**বাঙ্গালি হিন্দুর ভাষাদিবস শুরু হোক দাড়িভিট থেকে**
□ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস □ ২৮

**প্রকৃতিই গায় আগমনী** □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

**শব্দস্বরূপ মহামায়া** □ অমিত ঘোষ দস্তিদার □ ৩৩

**৯-কারের বিলোপ সাধন প্রসঙ্গে কিছু আত্মগত কথা**
□ ড. প্রণব বর □ ৩৫

**অমর্ত্যর মর্ত্যকথা** □ অমিত দাস □ ৪৩


**নিয়মিত বিভাগ**


**উবাচ : ১০** □ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** □ **অঙ্গনা : ২১** □
**সুস্বাস্থ্য: ২২** □ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** □ **চিত্রকথা : ৪০** □
**রঙ্গম : ৪১**□ **অন্যরকম : ৪২** □ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৮**□ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৪৯**

প্রকাশিত হবে
৩০ সেপ্টেম্বর
২০১৯

# স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৩০ সেপ্টেম্বর
২০১৯

## আগামী সংখ্যার (৩০.৯.১৯) বিষয়

### ছোটবেলার পুজো

আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হবে স্বস্তিকার পুজো সংখ্যা। পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ৩০.৯.২০১৯ তারিখে। ঢাকে কাঠি পড়ে যাবার পর পুজো ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে কারোরই ভালো লাগে না। স্বস্তিকার ৩০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত সংখ্যায় থাকবে 'ছোটবেলার পুজো' বিষয়ে কয়েকটি রচনা। লিখবেন স্বস্তিকা পরিবারের সদস্যরা। সম্ভাব্য লেখকদের মধ্যে রয়েছেন সুকেশচন্দ্র মণ্ডল, অভিজিৎ রায়চৌধুরী, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, শিশির গাঁতাইত, অজিত ভকত প্রমুখ।

**সত্বর কপি বুক করুন।। দাম : বারো টাকা মাত্র**


## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

**AXIS Bank Ltd.**

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata**


সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## ইসলামিক আগ্রাসনেরই একটি রূপ দাড়িভিট

২০১৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর পুলিশের গুলিতে দাড়িভিটের মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছিল রাজেশ এবং তাপস। বাংলা ভাষা এবং বাঙ্গালির সংস্কৃতিকে ইসলামিক আগ্রাসন হইতে রক্ষা করিতে গিয়া প্রাণ দিয়াছিলেন এই দুই যুবক। ইসলামিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের লড়াইয়ের প্রকৃত ইতিহাস যদি কোনোদিন রচিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চিত রূপে রাজেশ এবং তাপস বীরের সম্মানই লাভ করিবেন। ঠিক কী ঘটিয়াছিল এক বৎসর আগে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী উত্তর দিনাজপুরের এই গ্রামটিতে? দাড়িভিট গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয়টিতে বাংলা এবং বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাব ছিল। ওই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরিয়াই বাংলা এবং বিজ্ঞান শিক্ষকের দাবি জানাইয়া আসিতেছিল। কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর ছাত্র-ছাত্রীদের এই দাবি মানে নাই। তাহারা বাংলা এবং বিজ্ঞান শিক্ষকের বদলে একজন উর্দু শিক্ষককে নিয়োগ করিয়াছিল। উল্লেখনীয় এই যে, ওই বিদ্যালয়ে একজনও উর্দুভাষী ছাত্র-ছাত্রী নাই। তৎসত্ত্বেও ওই বিদ্যালয়ে উর্দুভাষী শিক্ষককে নিয়োগ করিয়াছিল বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর। উদ্দেশ্যটি পরিস্কার। শিক্ষায় আরবিকরণ, আরও বিশদে বলিলে ইসলামিকরণের উদ্দেশ্যেই এইরূপ একটি অসাধু কর্ম বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা দপ্তর করিয়াছিল—তাহাতে কোনো দ্বিমত নাই। এই উর্দু শিক্ষক নিয়োগের প্রতিবাদেই ওই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভে রত হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের এই বিক্ষোভ দমন করিতেই বেপরোয়া পুলিশ সেইদিন গুলি চালাইয়াছিল। সেই গুলিতেই নিহত হন দুই যুবক — রাজেশ এবং তাপস। এই ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি জানাইয়াছিল মৃত রাজেশ এবং তাপসের পরিবার। রাজ্য সরকার সেই দাবি মানে নাই। প্রতিবাদে সৎকার না করিয়া ওই দুই যুবকের মরদেহ গ্রামেই মাটি চাপা দিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ভাষা শহিদ রাজেশ এবং তাপস। উর্দুর আগ্রাসন হইতে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করিতে গিয়া তাহারা জীবন দিয়াছে। পঞ্চাশের দশকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে গিয়া অনুরূপভাবে পাকিস্তানি পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়াছিলেন বরকত-রফিক-জব্বাররা। এখনো প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি তাহাদের স্মরণে ঘটা করিয়া ভাষণ দিবস পালন করেন এই রাজ্যের বুদ্ধিজীবী সমাজ। অথচ উর্দুর আগ্রাসন হইতে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করিতে গিয়া মাত্র এক বৎসর আগে আমাদেরই ঘরের যে দুই কিশোর প্রাণ হারাইল—তাহাদের সম্বন্ধে ইহারা নিশ্চুপ। এই বিদ্বজ্জনেরা বাংলাদেশে গিয়া লম্ফঝম্প করিয়া আসেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দাঁড়াইয়া একবারও বলেন না—উর্দু নয়, বাংলা চাই।

আসলে দাড়িভিটের ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ইসলামিক আগ্রাসনের যে ঘৃণ্য প্রচেষ্টা এই রাজ্যে গত প্রায় এক দশক ধরিয়া চলিতেছে, দাড়িভিটের ঘটনা তাহারই একটি অঙ্গমাত্র। ২০০৭ সালে কলিকাতা হইতে তসলিমা নাসরিনকে বিতাড়ন করিবার ঘটনার ভিতর দিয়া এই প্রয়াস শুরু। তাহার পর বিভিন্ন ঘটনায় ইসলামিক আগ্রাসনের নগ্ন রূপটি প্রকাশ পাইয়াছে। এই আগ্রাসনের হাত হইতে বাংলা ভাষাও রক্ষা পাইতেছে না। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ের পাঠ্য বইয়ে বাংলায় পরিবর্তে উর্দুর অনুপ্রবেশ ঘটাইয়া শিশু মনে প্রভাব বিস্তারের অপচেষ্টা হইয়াছে। দাড়িভিটের বিদ্যালয়ে বাংলা এবং বিজ্ঞানের পরিবর্তে উর্দু শিক্ষক পাঠাইবার ভিতরও এই ষড়যন্ত্রই লুক্কায়িত ছিল।

রাজেশ-তাপস সেই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। তাহারা প্রমাণ করিয়াছে—জীবনের অর্থ নিছক বাঁচিয়া থাকা নয়। জীবনের অর্থ আরও অনেক কিছু।

## সুভাষিতম্

*শান্তিতুল্যং তপো নাস্তি ন সন্তোষাৎ পরং সুখম্।*

*ন তৃষ্ণায়াঃ পরো ব্যাধিঃ ন চ ধর্মো দয়াপরঃ।।*

*শান্তির সমান তপস্যা নেই, সন্তোষের চেয়ে বড়ো কোনো সুখ নেই। লোভের চেয়ে বড়ো ব্যাধি নেই এবং দয়ার চেয়ে বড়ো কোনো ধর্ম নেই।*

# কুনাট্য বামপন্থী রঙ্গে, লোকে মজেছে ভারত-বঙ্গে

**বিশ্বামিত্র-র কলম**

দেশের মানুষের আমোদ উপভোগের এখন আর কোনও সীমা পরিসীমা থাকছে না। বিনোদনের ভরপুর পসরা সাজিয়ে বামপন্থীরা নিত্য নতুন হাজির হচ্ছেন ভারতবর্ষের মানুষের সামনে। আপাতত দুটি মজার কাহিনি বলা যাক। প্রথমত, চন্দ্রযান ল্যান্ডার বিক্রমের চাঁদের মাটি ছোঁয়ার দু' কিলোমিটার আগে ইসরোর সঙ্গে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর বামপন্থীরা যেভাবে বিজয়োল্লাসে মেতেছিল, পাকিস্তান-বাংলাদেশও লজ্জা পাবে। দ্বিতীয়ত, জে এন ইউ-তে টুকরে গ্যাঙের জয় ও সেইসূত্রে 'ভারত তেরি টুকরে হোঙ্গে'র অপরিণত স্বপ্ন চাগিয়ে ওঠা। এর ফলে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে যে সর্বাত্মক ভাঁড়ামির সৃষ্টি হয়েছে, তাতে ভারতবাসী নিষ্কলুষ বিনোদন উপভোগের সুযোগ পাচ্ছেন।

রগড়টা অন্য জায়গায়। জে এন ইউ-এর সভাপতি পদে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঐশী ঘোষ। সাংবাদিক সম্মেলনে তাগাবাঁধা হাতে তাঁকে 'বিপ্লব' করতে দেখা গিয়েছে। যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো হাসাহাসি শুরু হয়েছে যে দেশে বামপন্থার একী হাল! একে নিরীশ্বরবাদের মুখোশ, তার ওপরে মুসলিম লিগের দোসর, এরপর বিজ্ঞান টিজ্ঞান, যুক্তিবাদ টুক্তিবাদের দোহাই-অজুহাত উড়িয়ে কিনা হিন্দুধর্মের 'কুসংস্কার' তাগাবাঁধা, তাবিজ-কবচও কিছু লুকানো আছে কিনা ভাগবানই জানেন, অন্য সময় হলে আগুনখেকো বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর কমিউনিস্টরা এত অনাচার যেন নিত না। কিন্তু পরিবেশ- পরিস্থিতি বিচারে তাঁরা মানিয়ে নিতে জানেন। এমনিতে এখন বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর যা হালত তাতে ক'দিন বাদে নির্বাচন কমিশন এদের দেউলিয়া ঘোষণা করে দিতে পারে, তারপর যাদুঘরে যাওয়া ছাড়া অন্যত্র গত্যন্তর নেই।

তবে কিনা দল মরলেও আদর্শ মরে না, বামপন্থী টুকরো ভারতকে টুকরো করতে জোটবদ্ধ হয়ে জে এন ইউ-এর মাধ্যমে ফের তা প্রমাণ করলেন। পাঠকের অবগতির জন্য বলি, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে বামপন্থীদের সবসময় দাপট ছিল ঠিকই, কিন্তু পরিস্থিতির বিচারে পার্থক্য আছে। আগে দু'টি বামপন্থী ছাত্র-সংগঠন পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতো। একটি নকশালপন্থী আইসা, অন্যটি এস এফ আই, সিপিএমের ছাত্র-সংগঠন। এছাড়া সিপিআই-এর এ আই এস এফ, এস ইউ সি-র এ আই ডি এস ও এরাও নানান পারমুটেশন-কম্বিনেশনে ছাত্র-সংসদ নির্বাচনে মাঠে নেমে পড়ত। স্বাধীনতার পরে চীন যুদ্ধ ও আর তারও পরে জরুরি অবস্থাকে কেন্দ্র করে এদেশের কমিউনিস্টরা হরেক প্রজাতিতে বিভক্ত হয়, মূল ভাগ দুটি একদল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় থেকে বিপ্লব করতে অর্থাৎ দেশের পরিকাঠামোর সুযোগ-সুবিধা নিয়ে অবাধে লুঠপাট চালাবে। এ রাজ্যে ৩৪ বছরের ক্ষমতাসীনেরা তার প্রমাণ।

অন্যদিকে আরেক দল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাইরে থেকে দেশ লুঠ করবে অর্থাৎ খুন-জখম ইত্যাদি অগণতান্ত্রিক উপায়ে দেশে ক্ষমতা কায়েম করবে। যাইহোক, ছাত্র রাজনীতিতে এই দুই গোষ্ঠীর সদ্ভাব তেমন ছিল না। বিশেষত অগণতান্ত্রিক নকশালরা গণতান্ত্রিক বাম-গোষ্ঠীকে শ্রেণীশত্রু বলেই মনে করতো। জে এন ইউ-এর এই পরস্পর বিরোধী বাম গোষ্ঠীর চালচিত্রটা বদলে যেতে থাকে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর। স্বাধীনতার আগে পরে মানুষকে ভুল বোঝানোর, ও নেহরু গোষ্ঠীর যে পৃষ্ঠপোষকতা তারা লাভ করেছিল তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গণতান্ত্রিক-অগণতান্ত্রিক দুই প্রজাতির বামপন্থীরাই প্রমাদ গোনে। ভারতের মানুষ কুলোর বাতাস দিয়ে এই দেশদ্রোহীদের তাড়িয়েছেন। তবু 'দল মরলেও আদর্শ মরে না' গোছের তত্ত্ব টেকাতে এস এফ আই, ডি এস এফ, আইসা, এ আই এস এফ জোট বেঁধে এখন লড়াই করে প্রধান প্রতিপক্ষ অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের বিরুদ্ধে। এবিভিপি-কে যেনতেনপ্রকারেণ জে এন ইউতে ঠেকাতে তাদের হবেই, কারণ সারা দেশে এবিভিপির জয়জয়কার, এমনকী বামপন্থীদের শিবরাত্রির সলতে কেরলেও, তারা জে এন ইউ-তে জিতলে আর টুকরে গোষ্ঠীর আদর্শ থাকে কোথায়? চীন-পাকিস্তানও বা অক্সিজেন পায় কোথায়? তাই শ্রেণীশত্রুরা আপাতত এক হয়েছে। এদের কষ্টার্জিত জয় যা দেখে বামপন্থীদের প্রেমে হাবুডুবু ভাব, জয়ী সভানেত্রীর তাবিজ-কবচ নিয়ে কোনও কথা না বলার সনির্বন্ধ অনুরোধ, পারলে এই মুহূর্তে মোদী-অমিত শাহকে পাল্টে কারাট-ইয়েচুরিকে সাউথ ব্লকে বসিয়ে দেয়, এসব দেখে মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় হাসবেন না কাঁদবেন, রাগবেন না চটবেন তাই ঠিক করে উঠতে পারছেন না। নির্মল আনন্দ আরও বাড়িয়েছে যে ছাত্র নির্বাচনে দেশদ্রোহীদের জয়ে বামপন্থীদের এত উচ্ছ্বাস তার প্রভাব জে এন ইউ ক্যাম্পাসের বাইরের রাস্তা নিউ মেহরউলি রোডেও পড়বে না, অথচ বামপন্থীরা তাবিচ-কবচ পড়া ঐশীকে এখনই প্রধানমন্ত্রী করে দেয়, কানহাইয়াকে রাষ্ট্রপতি।

এদিকে আবার 'এতদিন চাঁদ কেন, পোড়া রুটি দাও' মার্কা-বাম আদিখ্যেতায় কান পাতায় দায় হচ্ছিল। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে প্রথম দেশ হিসেবে ভারতের অভিযানে তাদের আপত্তি কোথায়, সেটা অ্যাদ্দিনে ধরা পড়ল। বোঝা গেল বিজ্ঞানে, মহাকাশচারী অভিযান ভারতের এমন সম্মান বামপন্থীদের হজম হবার নয়, তাদের পিতৃপুরুষ চীন পারেনি কিনা, তায় আবার হংকং-কেস খেয়ে বসে আছে। ফলে ভারতের চন্দ্র অভিযানের আপাত ব্যর্থতায় তাদের দাঁত নখ বেরোবেই। ভারতবাসীর এখন দায় শুধু এই দেশদ্রোহীদের প্রকৃত স্বরূপ চিনে নেওয়া। এবং এদের পৃষ্ঠপোষক নেহরুপন্থী সংস্কৃতিকে ঝেড়ে ফেলা। ■

# বামেরা ফিরছে বঙ্গে, দিল্লিতে

প্রিয় বঙ্গবাসী,

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মিলিত বামশক্তির জয় থেকেই এবার তারা ক্ষমতার অলিন্দে পৌঁছে যাবেন। সে অলিন্দ যেমন পশ্চিমবঙ্গে তেমনই দিল্লিতেও।

গোটা বিশ্বেই অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। তার প্রভাব তো ভারতে পড়বেই। তার উপরে মোদী সরকার নগদ কারবারে যে ভাবে রাশ টেনেছে তাতে ছদ্ম অর্থনীতিও ধাক্কা খেয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। বরং দীর্ঘমেয়াদি ভালো ফল পাবে ভারত। কিন্তু সেটাও ভালো চোখে না দেখে ভারতের অবস্থা খুব খারাপ বলে বাজারে নেমে পড়েছে বামদলেরা। বাজার মানে ফেসবুক। তার বাইরে আর বাম কোথায়?

চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছে গিয়েছে ভারত। এ সাফল্য দেখে গোটা বিশ্ব উঠে দাঁড়িয়েছে। সম্মান দেখিয়েছে ইসরোকে। বামেরাও আনন্দিত। কারণ, অবশ্য ইসরোর বিশাল সাফল্য নয়। সামান্য ব্যর্থতা।

এই সমস্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম এবং অবশ্যই প্রগতিশীল আনন্দবাজার গোষ্ঠী এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় বাম এবং প্রগতিশীলদের উল্লাস দেখে মনে হচ্ছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার যে কোনও সময় পড়ে যাবে এবং জেএনইউ-এর ক্যাম্পাস থেকে কুচকাওয়াজ করতে করতে দখল করে নেবে।

কমরেড ইয়েচুরি না সূর্যকান্ত মিশ্র? সেই বাম সরকারের মার্গদর্শক মণ্ডলীতে কে বেশি গুরুত্ব পাবেন, এই নিয়ে যখন বামপন্থীরা আলোচনায় বিভোর, তখন জানিয়ে রাখা ভালো জেএনইউ-এর নির্বাচন দিল্লিতে তার পাশের পাড়া বসন্ত কুঞ্জকেও প্রভাবিত করতে পারে না।

ঠিক যেমন প্রেসিডেন্সি আর যাদবপুরের ছাত্র সংসদ দখল করতে পারলেই পশ্চিমবঙ্গের মসনদে বসা যায় না, তেমনই জেএনইউ যদি কোনও রাজনৈতিক মাপকাঠি হয় তাহলে কমরেড ইয়েচুরি এতদিনে দু' তিনবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতেন আর কানহাইয়া কুমার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী।

বঙ্গজ সাংবাদিককুল ঐশী ঘোষের মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা আবিষ্কার করে ফেলেছেন, তাঁরা দুর্গাপুর পুরসভার পরবর্তী নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করুন না। ঐশী দুর্গাপুর পুরসভায় কাউন্সিলর হতে পারলে এটা নিশ্চিত যে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট ঘুরে দাঁড়াবে।

এখনও জেতেননি সভাপতি পদে। তাতেই স্বপ্নে বিভোর আনন্দবাজার লিখেছে, ''দিল্লিতে বাম ছাত্রদের এই লড়াইয়ের প্রধান মুখ পশ্চিমবঙ্গের মেয়ে ঐশী ঘোষ। দুর্গাপুরের মেয়ে ঐশীকে ইতিমধ্যে অনেকেই বলছেন কানহাইয়া কুমারের উত্তরসূরি।"

কাব্যি করতেও ছাড়েনি বাম কাগজটি। লিখেছে, ''আকাশের দিকে তর্জনী। ভিড়ের হাততালি, ড্রামের আওয়াজ ছাপিয়ে গলা চড়ছে, 'স্বতন্ত্রয়ম, জনথিপত্যম, সোশ্যালিজম জিন্দাবাদ'। শেষের জিন্দাবাদ-এর সঙ্গে আত্মবিশ্বাস, প্রত্যয়ে মুঠো হচ্ছে হাত। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র জিন্দাবাদ নয়। বাঙ্গালি কন্যা স্লোগান ছুড়ছেন খাঁটি মালয়ালমে। তাঁকে ঘিরে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে 'লাল লহর' উঠছে। একদা বামদুর্গ পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরের মেয়ে ঐশী ঘোষের বিশ্বাস, বঙ্গে ফের বামেরা ঘুরে দাঁড়াবে।"

ঐশী ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের মেয়ে তাতে এখনও সে অর্থে ছোটো মেয়ে। তাই প্লিজ কেউ হাসবেন না ওঁর স্বপ্ন শুনে। বরং, আসুন আমরা সবাই মিলে অপেক্ষায় থাকি সেই দিনের জন্য। হাসতে যদি চান তার জন্য কুমার আছেন। প্রশান্ত নয় কানহাইয়া কুমার।

কানহাইয়া কুমার টুইট করেছেন, 'গোলওয়ালকর, হেডগেওয়ার, সাভারকরকে হারিয়ে ভগৎ সিংহ, আশফাক, গাঁধী ও অম্বেদকরের জয়। প্রগতিশীল বিচারধারার জয়!'

হাসি চাপবেন না প্লিজ।

**—সুন্দর মৌলিক**

অতিথি কলম

# এক দেশ এক সংবিধান সত্যিই কি তাই?

রবিন ডেভিড

জম্মু-কাশ্মীরের প্রসঙ্গ আলাদা রাখুন, শুধু দলের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রাখতে ভারতের চারটি রাজ্যে সংবিধান কি লঙ্ঘিত হচ্ছে না? দেশের চারটি বড়ো রাজ্যের সরকারগুলি সেখানকার কী সরকারি কী বেসরকারি ক্ষেত্রের দুই তৃতীয়াংশ চাকরি কেবলমাত্র সেই রাজ্যের মাতৃভাষীদের জন্য যদি সংরক্ষিত করে রাখে তাহলে তাকে কি সংবিধানানুগ বলা যায়?

অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রে চাকরি পাওয়ার সময় সেখানে বসবাসকারী সকল নাগরিককে আদৌ স্থানীয় চাকরিপ্রার্থী বলে গণ্য করা হয় না বা হবে না। কেবলমাত্র সেই সমস্ত লোক যারা একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে সেই রাজ্যের সীমার মধ্যে বসবাস করছে তারাই যোগ্য বলে গণ্য হবে। উল্লেখিত চারটি রাজ্য ভারতের মোট ভৌগোলিক অঞ্চলের ৩০ শতাংশ। এখানকার সরকারগুলি চাকুরির ক্ষেত্রে খানিকটা ঘেটো সিস্টেম চালু করেছে বা চালু করার পথে চলেছে। সংবিধানের অন্যতম আবশ্যিক শর্ত জন্ম বা বসবাসের ভিত্তিতে দেশের নাগরিকদের কোনো সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনোরকম বৈষম্য করা চলবে না। সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি ও ৩৫এ ধারার খারিজ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য সরকারের কে স্থায়ী বাসিন্দা আর কে নয় সেই চিহ্নিতকরণের অধিকার আর বলবৎ নয়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে দেখা যাচ্ছে যে অধিকার কাশ্মীর হারিয়েছে এই চারটি রাজ্য সেই অধিকার নতুন করে অর্জন করেছে, অর্জনের পথে আইন প্রণয়ন করছে। তর্কের খাতিরে অনেকে বলতে পারেন ঐতিহাসিকভাবে কোনো কোনো রাজ্যের জনগণের মধ্যে বহুক্ষেত্রে সুযোগ পাওয়া নিয়ে ভারসাম্যের অভাব ও নানাবিধ বৈষম্য দূর করতে সংবিধানের ৩৭১ নং ধারায় এই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির আছে। এ বিষয়ে আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা দরকার যে, স্বাধীনতার ৭২ বছর পরেও আমরা এই বিশেষ সুবিধের তালিকায় আর কত সংযোজন ঘটাবো।

এই বছর ১৫ আগস্ট লালকেল্লায় ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তলনের সময় প্রধানমন্ত্রী গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন যে, শেষমেষ দেশ এইবার এক জাতি, এক সংবিধানের অধিকারী হলো। ৩৭০ ধারা বিলোপের পর সংবিধানের আর কোনো ফারাক রইল না। সেই একই দিনে অন্তত তিনটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা তাঁদের রাজধানী শহরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর হয় চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যের পাকাপাকি বাসিন্দাদের বিশেষ অধিকারের স্বপক্ষে দাঁড়ালেন, নয়তো যত দ্রুত সম্ভব এমন আইন লাগু করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এমন ঘোষণার মাধ্যমে তাঁরা যে অবলীলায় সংবিধান স্বীকৃত নাগরিক অধিকারকে লঙ্ঘন করে গেলেন যে কথা কেউ ঘুণাক্ষরেও খেয়ালই করল না।

অবশ্যই সদ্য নির্বাচিত হওয়ার পর অন্ধ্রপ্রদেশের টগবগে মুখ্যমন্ত্রী জগমোহন রেড্ডি তুমুল উৎসাহে গত ২২ জুলাই রাজ্যে শিল্প ও কলকারখানা আইনে জরুরি সংশোধন এনে নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যবাসীকে বিশেষ অধিকার প্রদান করেছেন। বিধানসভায় আইনটি পাশ হয়ে গেছে। মধ্যপ্রদেশের ও কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীরাও স্বাধীনতা দিবসের বক্তৃতায় এই একই ধরনের 'ভূমিপুত্র সংরক্ষণের' প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, মহারাষ্ট্রের শিল্পমন্ত্রী সুভাষ দেশাই এই সূত্রে ১ আগস্ট এক বিবৃতি দিয়ে ঘোষণা করেছেন রাজ্যে তাঁদের সরকার ভূমিপুত্রদের জন্য ন্যূনতম ৮০ শতাংশ চাকুরি সংরক্ষণ চালু করবেন। তিনি জানান ১৯৬৮ সাল থেকেই রাজ্যে এই আইনটির অস্তিত্ব আছে এখন তিনি সেটিকে কার্যকর করবেন। এক পা এগিয়ে গিয়ে তিনি বলেছেন, যে সমস্ত সংস্থা এই নিয়মের বিরুদ্ধে যাবে তাদের ক্ষেত্রে জিএসটি সংক্রান্ত সুবিধে প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। এর মধ্যে কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র বিজেপি শাসিত রাজ্য। মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশ অন্য দল শাসিত। মনে রাখা দরকার, মুম্বাই ও বেঙ্গালুরুর বিশাল

> "পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে গোটা বিষয়টাই রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা অটুট রাখা প্রাথমিক কর্তব্য না সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা তারই লড়াই। ভেবে দেখুন। এই ধরনের কেবলমাত্র জনপ্রিয়তা বাড়ানোর চেষ্টাকে বাধা দিয়ে কোনো রাজনৈতিক নেতা কিংবা দল কি আদৌ সংবিধানের নির্দেশ রক্ষা করার হিম্মত দেখাতে এগিয়ে আসবে?"

শহরাঞ্চল ভারতের অর্থনীতির চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। আর এই ইঞ্জিনকে মূলত চালিয়ে নিয়ে যায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রতিভাবান অ-ভূমিপুত্রেরা।

বাইরে থেকে আসা চাকুরি সংক্রান্ত আইন পাশ করার আগে ইয়েদুরাপ্পা ও ফড়নবীশের কিন্তু গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিত যে আজকের যে বেঙ্গালুরু বা চাকচিক্যময় মুম্বাই শহর দৃশ্যমান তা কি অভূমিপুত্রদের যোগদান ছাড়া সম্পূর্ণ হতো? তাছাড়া এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীরা কি বুক ঠুকে বলতে পারবেন তাঁরা একনিষ্ঠ ভাবে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, কিন্তু চাকুরি প্রদানের ক্ষেত্রে তা ঠিক মানেন না? জগন রেড্ডি আবার সারা বিশ্ব থেকে বিনিয়োগ তাঁর রাজ্যে আনতে চান। এ কারণে গত ১০ তারিখে মহা আড়ম্বরে তিনি ত্রিশটি দেশের প্রতিনিধিদের তাঁর রাজ্যে আহ্বান করে এনেছিলেন। এর মধ্যে ১৬ জন বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতও আছেন। বিজয়ওয়াড়ায় এঁদের জন্য লালকার্পেট অভ্যর্থনা হয়। যাতে বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট হন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে দেশের বাইরে থেকে আসা অর্থের জন্য সাদর আমন্ত্রণ কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশে দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিভাবান মানুষজন পরিত্যাজ্য। তাদের শুধুমাত্র অন্ধ্রের ভূমিপুত্রই হতে হবে। জগমোহন নিশ্চয় খবর রাখেন যে বর্তমানে অন্ধ্রের বহু কুশলী প্রয়োগবিদ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছেন। এবং তাঁরা কাজের মাধ্যমে যথেষ্ট সুনামও অর্জন করেছেন। আর, ইয়েদুরাপ্পা যদি ভূমিপুত্র সংরক্ষণে এককাট্টা হয়ে বেঙ্গালুরুতে নিযুক্ত তাবৎ অন্ধ্রপ্রদেশের গুচ্ছ গুচ্ছ তথ্য প্রযুক্তিবিদদের তাড়িয়ে দিতে তৎপর হন সেক্ষেত্রে তিনি নিজ রাজ্যের মহা বিপদ ডেকে আনবেন।

অন্ধ্রের শিল্প সম্মেলনে উপস্থিত বিদেশি কূটনীতিকদের জগন যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেন যদি মার্কিন রাষ্ট্রপতি সে দেশে কর্মরত অনাবাসীদের চাকরি কেড়ে নিয়ে আমেরিকানদের অগ্রাধিকার দেন তিনিই বা তাঁর রাজ্যের স্বার্থে তা করতে পারবেন না কেন? একটি দেশের অন্তর্গত একটি রাজ্যের সঙ্গে একটি ক্ষমতাশালী বড়োদেশের তুলনা টানাটাই অবাস্তব। অন্ধ্রপ্রদেশ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ভারতবাসীকে কখনই বলতে পারবেন না তোমরা ভিসা নিয়ে অন্ধ্রে ঢোক, কিন্তু আমেরিকা তা পারবে। এছাড়া ট্রাম্পের অধীনস্থ মার্কিনি প্রশাসনকে ইতিমধ্যেই অনেকে জাতি বিদ্বেষী আখ্যা দিয়েছেন। ট্রাম্পের অভিবাসন বিরোধী নীতিগুলি অধিকাংশই রাজনৈতিক চরিত্রের। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে ট্রাম্পের সাদা চামড়ার অনুগত মার্কিন ভোটদাতাদের তুষ্টিকরণ, অভিবাসন নীতির সঙ্গে বাস্তবে মার্কিনিদের চাকরি সংরক্ষণ করে রাখার কোনো বাস্তব সম্পর্কই নেই। এই বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি সূত্র ও স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান চালানো সংস্থাগুলির কাজ থেকে যে বিপুল সংখ্যক পরিসংখ্যান হাতে এসেছে তা থেকে এটাই প্রমাণ হয়েছে যে বহিরাগত বিদেশিরা তাঁদের কাজের মাধ্যমে সে দেশের চাকরির বাজারকে প্রসারিত করতে সাহায্যই করেছেন। নতুন চাকরি তৈরি করিয়েছেন।

অন্ধ্রপ্রদেশের ভূমিপুত্র সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে রাজনীতি করার একটা দীর্ঘ অতীত পরম্পরা আছে। সপ্তম নিজামের সময় 'Mulki Rule' নাম দিয়ে যে আন্দোলন চলে তার পরিণতিতে সংবিধানে ৩৭১ডি ধারার সংযোজন হয়। এর ফলে শিক্ষা ও সরকারিক্ষেত্রে স্থানীয়দের জন্য 'কোটা' ব্যবস্থা চালু হয়। জগমোহনের চালু করা নতুন চাকুরি সংরক্ষণ আইন বেসরকারি ক্ষেত্রগুলিতেও ভূমিপুত্রদের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করার ধারায় নবতম সংযোজন মাত্র।

পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে গোটা বিষয়টাই রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা অটুট রাখা প্রাথমিক কর্তব্য না সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা তারই লড়াই। ভেবে দেখুন। এই ধরনের কেবলমাত্র জনপ্রিয়তা বাড়ানোর চেষ্টাকে বাধা দিয়ে কোনো রাজনৈতিক নেতা কিংবা দল কি আদৌ সংবিধানের নির্দেশ রক্ষা করার হিম্মত দেখাতে এগিয়ে আসবে? প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী ১ মাস আগে বিধানসভায় এই সংরক্ষণ আইন পাশ হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত কেউই এটিকে চ্যালেঞ্জ করেনি বা আদালতে যায়নি।

*(লেখক টাইমস অব ইন্ডিয়ার হায়দরাবাদ সংস্করণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদক)*

## একটি আবেদন

ঈশ্বরের আশীর্বাদে ও সকলের সহযোগিতায় গত ৭১ বছর ধরে স্বস্তিকা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। জাতীয়তাবাদী মানুষ হিসেবে আপনি যে কথা জানতে চান, স্বস্তিকা-র পাতায় আপনি তা পাবেন। বাজার চলতি সংবাদপত্রে যেখানে দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি থাকে না, অন্যান্য খবরের ভিড়ে আসল খবরটাই যেখানে হারিয়ে যায়, স্বস্তিকা সেখানে সত্যটাকেই তুলে ধরে। স্বস্তিকা-র বক্তব্যে তখন আপনি আপনার মনের কথাটি খুঁজে পাবেন। স্বস্তিকা-র প্রতিটি সংখ্যাই বিষয়, বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। পরিবারের সবার সঙ্গে বসে পড়ার মতো কাগজ।

৭২ বর্ষে পদার্পণকে কেন্দ্র করে স্বস্তিকা ১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত গ্রাহক সংগ্রহ অভিযানের আয়োজন করেছে। ৫০০ টাকা দিয়ে আপনিও স্বস্তিকা-র বার্ষিক গ্রাহক হোন— এই অনুরোধ। স্বস্তিকা আপনার সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার প্রত্যাশী।

বিঃ দ্রঃ— ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯-এর পূর্বে গ্রাহকমূল্য (৫০০ টাকা) স্বস্তিকার কার্যালয়ে জমা দিলেই পূজা সংখ্যা (২০১৯) পাওয়া যাবে।

**প্রচার প্রসার বিভাগ, স্বস্তিকা**

# রম্যরচনা

## সত্যি নাকি ?

আত্মার মৃত্যু হয় না, কেবল শরীর বদল করে।
নেতাদেরও মৃত্যু হয় না, কেবল দল বদল করে।

* * *

কিছু মানুষের ব্রেন আর পৌরসভার ড্রেন
কোনোদিন পরিষ্কার থাকে না।

* * *

একটা কথা আজও বুঝতে পারলাম না যে, গরিবদের জন্য লড়াই করতে করতে নেতারা কীকরে বড়োলোক হয়ে যায়।

* * *

মদ খেলে নাকি মুখ দিয়ে সত্যিকথা বের হয়, তাহলে আদালতে গীতা না ছুঁইয়ে দু'পেগ মদ খাইয়ে দিলেই তো হয়।

* * *

ভাবছি পালিয়ে গিয়ে রেলস্টেশনে গিয়েই থাকবো। কারণ ট্যালেন্টেড মানুষেরা রেলস্টেশন থেকেই উঠে এসেছে। যেমন– মোদী, ধোনি,রানু মণ্ডল।

## উবাচ

**নরেন্দ্র মোদী**
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

"৭ সেপ্টেম্বর রাতের ওই একশো সেকেন্ডের একটি ঘটনা পুরো দেশকে জাগিয়ে রেখেছিল। আর পুরো দেশকে সংযুক্তও করেছে। এই স্পিরিটকে আমরা ইসরো স্পিরিট বলব।"

***নয়া দিল্লিতে দ্বিতীয় মোদী সরকারের ১০০ দিনের রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ অনুষ্ঠানে***

**অমিত শাহ**
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

"নাগরিকত্ব বিল ৩৭১ ধারার প্রতিবন্ধক নয়। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে যেসব আইন প্রচলিত রয়েছে নাগরিকত্ব বিল পাশের পর সেসব অক্ষুণ্ণ থাকবে।"

***নাগরিকত্ব বিল প্রসঙ্গে***

**মুকুল রায়**
বিজেপি নেতা

"পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় এনআরসি-র বিরুদ্ধে বাম, তৃণমূল ও কংগ্রেসের বেসরকারি প্রস্তাবের কোনো মূল্য নেই। কারণ আগে দেশ, পরে রাজ্য। আগে নাররিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হবে তারপর এনআরসি আসবে।"

***রাজ্য বিধানসভায় বাম, তৃণমূল ও কংগ্রেসের এনআরসি বিরোধী প্রস্তাব প্রসঙ্গে***

**এন বীরেন সিংহ**
মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী

"মণিপুরে প্রত্যেক শনিবার প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর বাচ্চাদের স্কুলব্যাগ নিয়ে যেতে হবে না। ওই দিন 'নো স্কুলব্যাগ ডে' হিসেবে মানা হবে।"

***বাচ্চাদের মাত্রাতিরিক্ত পড়াশোনার চাপ ও স্কুলব্যাগের ওজন প্রসঙ্গে***

# নিম্নমেধার তৃণমূলি সংস্কৃতি সাফ হয়ে যাবে জাতীয়তাবাদী বঙ্গরাজনীতির জোয়ারে

**সুজিত রায়**

কয়েক কোটি পেশিসর্বস্ব ভেড়ার চেয়ে কয়েক হাজার মেধাসম্পন্ন সিংহ অনেক বেশি কার্যকর। বিশ্বখ্যাত এই প্রবাদবাক্যটির সৃষ্টি হয়েছিল ইহুদি জাতির মানুষের শুধু মেধাশক্তিই নয়, তাদের দেশপ্রেম এবং দেশের স্বার্থে নিজেদের সবকিছুকে উৎসর্গ করার জন্য যে তীব্র আবেগ, সেই জাতীয়তাবাদী মনোভাবকে সম্মান জানাতেই। তার প্রমাণ আজও স্পষ্ট ইহুদি জাতির একমাত্র স্বীকৃত দেশ ইজরায়েলের সার্বিক ক্ষমতায়নে। মাত্র বিরাশি লক্ষ জনসংখ্যার একটা দেশ গোটা বিশ্বের সমনে অন্যতম শক্তিধর এবং অন্যতম মেধাস্থান হিসেবে সগর্বে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত প্রতিভার জন্ম হয়েছে তার একটা বড়ো অংশই ইহুদি। মিলিয়ে নিন নামগুলি। আইনস্টাইন, ফ্রয়েড, বেটোফেন, কার্ল মার্কস, ম্যাক্স প্লাংক, নীলম বোর, বাক ওয়াগনার— এমন আরও অনেকেই ছিলেন ইহুদি পিতা-মাতার সন্তান। এ পর্যন্ত নোবেলজয়ীদের মধ্যে অর্থনীতিতে ৪১ শতাংশ, মেডিসিনে ২৮ শতাংশ, পদার্থবিদ্যায় ১৬ শতাংশ, রসায়নে ১৩ শতাংশ আর শান্তিতে ৬ শতাংশ জুড়ে রয়েছেন ইহুদিরাই।

আর ঠিক এই কারণেই ইহুদিরা ছিলেন নাৎসি নায়ক অ্যাডলফ হিটলারের চক্ষুশূল। কারণ একটাই। ঈর্ষা। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, ব্যবসা, বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং থেকে শুরু করে শিক্ষা, রাজনীতি, প্রতিরক্ষা— সবেতেই ইহুদিরা এগিয়েছিলেন জার্মানদের থেকে হাজার যোজন দূরত্বে। হিটলারের মতো পেশীশক্তি সর্বস্ব মধ্যমেধার নেতৃত্বাধীন দ্য ন্যাশানালিস্ট সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি তাই ১৯২০-র ২৪ ফেব্রুয়ারি জন্ম নেওয়ার মাত্র ২৫ বছরের মধ্যেই ১৯৪৫-এ ১০ অক্টোবরের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ দল ছিল হিটলার-সর্বস্ব আর হিটলার উগ্র দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠায় হয়ে উঠেছিলেন গণহত্যার আসামি এবং গণতন্ত্রের হত্যাকারী একনায়ক।

আলোচ্য প্রবন্ধের এই ভূমিকাটিকে অনেক পাঠক হয়তো ধান ভানতে শিবের গীত বলে মনে করছেন। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূলি অত্যাচার, বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী জনগোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক দল হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টির সক্রিয় কর্মীবাহিনী ও নেতৃত্বের ওপর অত্যাচার যে পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে যে পর্যায়ে পা রাখতে চলেছে, তার সঠিক চিত্রায়ণের জন্য প্রয়োজন ছিল এই 'শিবের গীত'টির।

কষ্ট করে মনে করতে হবে আজ থেকে কত দশক আগে শেষবারের মতো চোখে পড়েছে, পুলিশ লাঠি চালাচ্ছে সংসদ সদস্যের ব্রহ্মতালু লক্ষ্য করে? কত বছর আগে দেখেছেন, মহিলা আন্দোলনকারীদের সম্ভ্রম রক্ষার তোয়াক্কা না করেই পুরুষ-পুলিশ তাদের হিড়হিড় টেনে ভুলছে পুলিশ ভ্যানে? কতদিন আগে দেখেছেন কর্তব্যরত সাংবাদিকের কলার ধরে গলাধাক্কা দিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেলছে পুলিশ?

পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক রাজনীতির ওপর ভয়ংকর আক্রমণের নজির হিসেবে এতদিন সিদ্ধার্থশংকর রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বাধীন '৭২-এর জমানাকে চিহ্নিত করে আসা হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী থেকে অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ থেকে সংস্কৃতির ধারক-বাহকরা মেনে নিয়েছেন ওই যুগটি ক্ষণজীবী হলেও 'কালো যুগ' হিসেবে কুখ্যাত। তারপর রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে হাজার বিতর্ক থাকলেও রাজ্য প্রশাসনের গায়ে 'কালা যুগ'-এর ছাপ পড়েনি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের আবেগসর্বস্ব রাজনীতি সৃষ্ট 'ঘরের মেয়ে মমতা' বেদের মেয়ে জোছনার ধরাচুড়ো ছেড়ে মুখ্যমন্ত্রীর আসনটির দখল নেবার পর থেকেই বঙ্গ-রাজনীতিতে ফিরে এসেছে সেই কালা দিন। আরও ভয়াবহ, আরও তীব্র অসহনীয় এবং আরও রক্তাক্ত হয়ে।

শিক্ষকরা মাইনে চাইলে লাঠি খাবেন। সরকারি কর্মচারীরা মহার্ঘ ভাতা চাইলে লাঠি খাবেন। ছাত্ররা ঠিকঠাক ভাবে ক্লাস করতে চাইলে চড়-থাপ্পড় খাবে। পুলিশ গুলি চালিয়ে ঝাঁঝরা করে দেবে সদ্য পাপড়ি মেলা কিশোরের শরীর। হাসপাতালে চিকিৎসকরা মার খাবেন। আদালত চত্বরে আইনজীবীরা মার খাবেন। বিরোধী দলের নেতাদের গাড়ি নিয়ম করে ভাঙচুর করা হবে। এ পর্যন্ত রাজ্য বিজেপি নেতাদের গাড়ি ভাঙার দিন-তামামি হিসেব করলেই আক্রমণের নজিরটা কোন স্তরের তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। জাতীয়তাবাদী লেখক-শিল্পী- কলাকুশলীদের নামে নিন্দা, তৃণমূলেরই কোনও নেতা বা কর্মী দলের স্বার্থেই সমালোচনা করলে দলীয় সহকর্মীদের হাতেই মার খাবেন। বিরোধীরা কোনও রাজনৈতিক সভা করতে পারবেন না। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবেন না। জনসংযোগের স্বার্থে পাঁচটা মানুষের সঙ্গে বসে চা খেতে পারবেন না। প্রকাশ্যে নানা অছিলায় বিভিন্ন ক্লাব, পুজো সংগঠনগুলিকে সরকারি টাকা দিয়ে কিনে নেওয়া হচ্ছে। আসলে কেনা হচ্ছে ভোট। কিছু বলা যাবে না। বললে মাথায় লাঠি পড়বে। ছাত্র রাজনীতিতে গেরুয়া শিবিরকে গায়ের জোরে অচ্ছুৎ করে রাখা হবে। যে কোনো নেতা, কর্মীর টেলিফোন ট্যাপ করবে পুলিশ কোনো কারণ অথবা অজুহাত ছাড়াই। গণমাধ্যমগুলির মাপকাঠিটা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন মমতা যিনি মনে করেন—সরকার এবং শাসকদলের পক্ষে থাকতে হবে গণমাধ্যমকে। গণমাধ্যম কর্মীদের। এটা এ রাজ্যের নিয়ম। বেগড়বাই করলেই চাবুকের

কষাঘাতে জর্জরিত হতে হবে। এমনকী সাংবাদিকদের মূল সংগঠন কলকাতা প্রেসক্লাবও নিয়ন্ত্রণ করবেন তিনিই। তিনি ঠিক করে দেবেন— ক্লাবে নির্বাচন হবে কিনা। কে হবেন সভাপতি, কে হবেন সম্পাদক। সদস্যপদ পাবেন কারা— তা সে সংবিধানে যাই থাকুক না কেন।

আজ যখন ভারতবর্ষের দিকে দিকে জাতীয়তাবাদের মন্ত্র ছড়িয়ে পড়ছে প্রাচীন মুনিঋষিদের ওঙ্কারধ্বনিকে আধার করে, যখন মানুষ ইংরেজ শাসনের ৩০০ বছরের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ছায়াপাত আর স্বাধীন ভারতবর্ষের লজ্জাকর ৭২ বছরের ছায়াপথ থেকে বেরিয়ে এসে সত্যিকারের ভারতবর্ষকে চিনতে চাইছে, ফিরিয়ে আনতে চাইছে সেই ঐতিহ্য, সেই ধারাবাহিক সংস্কৃতি আরও উন্নতমানের করে গড়ে তুলে, তখন কিন্তু সেই নবসৃষ্টির কারিগরদের ওপরেও নেমে আসছে একই কষাঘাত। রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকুক আর নাই থাকুক, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত পর্যায়ে বিরোধ থাকুক আর নাই থাকুক— দেশকে ভালোবাসা যাবে না। দেশকে ভালোবাসার কথা বলা যাবে না। বলতে হবে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়। সে ভাষায় যতই নাটুকে আমোদ থাকুক না কেন।

ভাটপাড়া জ্বলছে। প্রতিদিন বোমার ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছে শিশুর, গর্ভবতী মায়ের। আমডাঙা জ্বলছে। অশীতিপর বৃদ্ধ রক্তস্রোত দেখে মূর্চ্ছা যাচ্ছেন। বর্ধমানের গলসীতে লাশ পড়ছে ঘন ঘন। মা বুক চাপড়াচ্ছেন। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া আসানসোল— পুলিশের সামনেই বাড়িতে বাড়িতে আগুন ধরানো হচ্ছে। বিরোধী শিবিরের মহিলাদের চুলের মুঠি, পরনের শাড়ি ধরে টানাটানি করা হয়। যে পুলিশ অফিসার শাসকদলের নেতা-কর্মীদের কোমরে দড়ি পরান, তাঁকে বদলি হতে হয়। কখনও বা দিনে চারবার। জেলাশাসক বদলে যায় দিনে দুবার-তিনবার। মানুষ আর্তনাদ করে। রানি শোনেন। তিনিও আর্তনাদ করেন— কাটমানি ফেরাও বলে। তিনি আর্তনাদ করছেন কারণ তাঁর ভাঁড়ারে টান পড়েছে। ফলত, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, স্বাস্থ্যশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, মিড ডে মিল, রূপশ্রী রূপ এবং শ্রী দুটোই হারিয়ে হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠে। নিম্নমেধার তৃণমূলিরা তখন উল্লাস করেন। কারণ তাঁরা মনে করেন, চালাকির দ্বারা তাঁরা মহৎ কাজটি করে ফেলেছেন। উচ্চমেধার বিরোধী শিবিরের সামনে হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের একটা অবয়ব ঝুলিয়ে রেখেছেন। তা না হলে নাৎসি বাহিনীর মতো নিদেনপক্ষে ২৫টা বছর ক্ষমতা আগলে রাখা যাবে না। আর ক্ষমতার গিঁট আলগা হওয়া মানে জাতীয়তাবাদীদের একত্রিত হওয়া। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। অতএব চাবুকটা চালিয়ে যাও। ওটাকে থামানো চলবে না। হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীর শকুনির দৃষ্টি ছিল ঘেটোগুলির ওপর। তার কারণ চূড়ান্ত অ্যান্টি সেমিটিজম বা ইহুদি বিদ্বেষ। গল্পে কবিতায় তাই বারবার চিত্রিত হয়েছে জিউ অব মাল্টার বারাবাস বা মার্চেন্ট অব ভেনিসের শাইলকের মতে চরিত্র। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই কখনও কিছুর বিনিময়ে, কখনও স্রেফ ভয় দেখিয়ে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদেরও কিনে নিচ্ছেন। দখলে রাখছেন যাতে মিথ্যা ইতিহাস লেখা হয় এবং তার জের চলে অন্তত ২৫ বছর। না, মমতার কোনও গোয়েবলস নেই। তিনি নিজেই নিজের গোয়েবলস। 'আপনার ঢাক আপনি পেটাও'— এই উপদেশামৃতটির অন্তর্নিহিত শক্তিটিকে মমতা ব্যানার্জির মতো সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগাতে পেরেছেন আর কে!

একমাত্র মমতা পেরেছেন, তাই আজও সব মানুষ বিশ্বাস করেন না, পশ্চিমবঙ্গবাসী বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের হাত ধরে উত্তপ্ত বারুদের স্তূপের ওপর বাস করছেন। বিশ্বাস করেন না— অপরাধীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেছে দেশি বন্দুক, বোমা, ভোজালি তৈরির গোপন কারখানা। মাওবাদীরা নেই। কিন্তু তাদের ছায়ারা রয়েছে শাসকদলে সেই বন্দুক, সেই এস এল আর নিয়ে। নামটা বদলে গেছে— তৃণমূলি।

এর আগে একমাত্র নকশাল যুগ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ কি কখনো দেখেছে এই ভয়াবহ অরাজকতা মাৎস্যান্যায়? পশ্চিমবঙ্গ কি কখনো দেখেছে একটি শাসকদলের এমন তীব্র লোভ, উদগ্র কামনা? যেখানে গরিব মানুষের ছেলেপুলেদের মিড ডে মিলের চাল, ডাল, ডিম বেপাত্তা হয়ে চলে যায় শাসকের রান্নাঘরে? দুধের শিশুরা ভাত খায় নুন দিয়ে?

বামপন্থীদের ৩৪ বছরের শাসনে একটা শব্দ আপামর পশ্চিমবঙ্গবাসীর ঠোঁটে ঠোঁটে ঘুরে বেড়াত— শ্রেণীশত্রু। বামপন্থীরা তাদের নিকেশ করত, কারণ তারা নাকি গরিবের শত্রু ছিল। আর এখন শ্রেণীশত্রুরাই খাদকের ভূমিকায়। শ্রেণীশত্রু তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বই এখন দিকে দিকে হিংসার আগুন ছড়িয়ে দিয়ে মজা লুটতে চাইছে। কারণ তাঁরা জানেন, বুদ্ধিমান সমাজ আবেগে ভেসে ভুল করতে পারে একবার। বারবার নয়। অতএব তাঁদের আয়ুও সীমিত। সেই সীমিত ক্ষমতায় মধ্যেই শ্রেণীশত্রু তাঁর যাবতীয় ক্ষোভ এবং ক্রোধের প্রকাশ ঘটিয়ে ফেলে। এর আরও একটা কারণ— চিরস্থায়ী কিছু করার ক্ষমতা বা মানসিকতা কোনোটাই তাঁর থাকে না। আবার অন্য কেউ তা করতে পারলে, শ্রেণীশত্রু রেগে যায়। অর্থাৎ মমতা এমন এক শাসক যাঁর ভোজালির দুদিকেই শান দেওয়া থাকে। যেতে কাটেন— আসতেও কাটেন। কিন্তু ভুলে যান— ধার পড়ে যাচ্ছে দুদিকেই একসঙ্গে। অচিরেই তাঁর অস্ত্র হয়ে যাবে ভোঁতা, অকার্যকর। 'সর্বনাশ সমুৎপন্নে' সেখানেই। নিম্নমেধার সমস্যাটা সেখানেই। আজ পশ্চিমবঙ্গে এই যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সেখানে প্রায় প্রতিদিনই রাজ্যপালকে আগ বাড়িয়ে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে, শ্রেণীশত্রুর নেতৃত্বের গালিগালাজও শুনতে হচ্ছে।

বিশ্ব-ইতিহাসে কোনও হিটলারই টেকেনি। পশ্চিবঙ্গেও টিকবে না। উচ্চমেধার জাতীয়তা এবং হিন্দু জীবনচর্যার যে স্বাদ ভারতবর্ষের মাটিতে পুনর্জন্ম লাভ করেছে, কোনও অল্পমেধার ঈর্ষা দিয়ে তার ব্যাপ্তি রোখা যাবে না। কোনও রাজনীতি দিয়ে সেই পরশ্রীকাতরতাবিহীন সমাজ গঠনের প্রক্রিয়াকে রোখা যাবে না। কোনও পেশীশক্তি দিয়ে পরাজিত করা যাবে না দেশপ্রেমের জোয়ারকে। কারণ উচ্চমেধা, মধ্যমেধা ও নিম্নমেধার ফারাকটা থেকেই যায়। মানুষও তফাতটা সহজেই বুঝে যায়। শুধু অপেক্ষার প্রয়োজন হয় মানুষের ঘোর কাটার। যে ঘোর কাটার পর মানুষ বুঝতে পারে— মেয়ের নয়া পরিচয় ফ্লাঙ্কেনস্টাইন আর যার সৃষ্টিকর্তা বাঙ্গালির আবেগ। জাতীয়তার পুনর্দীক্ষায় গোটা রাজ্যটাই উচ্চমেধা সংস্কৃতির ধারক-বাহক হয়ে উঠবে অচিরেই। ■

রাজ্য রাজনীতি

# স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বে এ রাজ্যে প্রশাসন সন্ত্রস্ত

**বলাইচন্দ্র চক্রবর্তী**

পশ্চিমবঙ্গ এখন একটি শিল্প-শ্মশানের নাম। সাধারণভাবে সারা ভারতেই একটা মন্দার বাজার বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের অভাবের অন্যতম কারণ হলেও এ রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলাজনিত অরাজকতাই সবচেয়ে বড়ো কারণ। তোলাবাজ আর দুষ্কৃতীদের দাপট এখন এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে যে ঢাকঢোল পিটিয়ে এবং কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে শিল্প সম্মেলন করে— ব্যয়ের সমতুল্য বিনিয়োগও আসছে না।

অ্যারিস্টটল তাঁর 'The Politics' গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকারের শাসন ব্যবস্থার পর্যালোচনায় লিখেছেন--- (১) এক ব্যক্তির স্বাভাবিক শাসনব্যবস্থাটি হলো রাজতন্ত্র আর তা বিকৃত হলে সেটা স্বৈরতন্ত্র, (২) বহুজন ব্যক্তির স্বাভাবিক শাসনতন্ত্র হলো গণতন্ত্র আর সেটা বিকৃত হলে তা হলো জনতাতন্ত্র। তাঁর বিচারে শ্রেষ্ঠ শাসনতন্ত্র হলো রাজতন্ত্র এবং নিকৃষ্টতম হলো জনতাতন্ত্র (তার মানে স্বৈরতন্ত্রের থেকেও খারাপ)। তাঁর এই শ্রেণীবিভাগ মোটামুটি মেনে নিলেও মাননির্ণয়ের সঙ্গে আধুনিক বিশেষজ্ঞরা দুটি কারণে দ্বিমত পোষণ করেন। প্রথমত, তাঁর কালের ব্যবস্থা ছিল নগরকেন্দ্রিক এবং তাছাড়া, তিনি রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য করেননি।

এখন প্রশ্ন হলো, আজকের পশ্চিমবঙ্গে কী চলছে— জনতাতন্ত্রের জার্সি গায়ে স্বৈরতন্ত্র নয় কি? জনতাতন্ত্র তো বলতেই হবে, কারণ মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর দলবল নির্ঘাত জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়েই এসেছেন, কিন্তু তামাম জনসাধারণের বিচারে আট বছরের শাসনে জার্সির ভেতরের পরিচয়টা কী দাঁড়াল? বিধানসভা দিয়েই শুরু করা যাক। কারণ সংবিধান মোতাবেক রাজ্যের উচ্চতম গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এটি। স্মরণে থাকতে পারে ক্ষমতায় এসে 'মা-মাটি-মানুষের' বা পরিচয় ভেদে 'পরিবর্তনের' সরকারের প্রধান সেই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বিরোধী সদস্যদের একটি মূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন— ''আপনারা, দশটি বছর ঠোঁটে লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে চুপটি করে বসে থাকুন।'' এই নির্দেশ অমান্য করার ধৃষ্টতা যাঁরা দেখিয়েছেন তাঁরা হেডদিদিমণির কড়া ধমক এবং সাঙ্গোপাঙ্গদের টিটকারির শিকার হয়েছেন। আর শাসকদলের বিধায়করা, মন্ত্রীসভার সদস্যগণ এবং এমনকী জেলাপরিষদ, পৌরসভা, পঞ্চায়েত সমিতি মায় গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যরাও তো তাঁরই মর্জি, থুড়ি— অনুপ্রেণায় চলতে বাধ্য হচ্ছেন। 'দিদিকে বলো' চালু হয়েছে তো সেই কারণেই।

বিজেপি কর্মীদের ওপর বাঁশ লাঠি নিয়ে আক্রমণ, পুলিশ নীরব দর্শক।

এই তো তাঁর নিজের দলের কিসসা। কেমন এই দল? নীতি-আদর্শ-লক্ষ্য সবকিছু একটিমাত্র ঠোঙায় পুরে তিনি দলটাকে বাজারে ছেড়েছিলেন— ঠোঙায় লেখা ছিল 'সিপিএম তথা বামফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করো'। ইতিহাস ও রাজনীতির পরিচিত অধ্যাপকদের প্রশ্ন করে জানা গেল এমন একনিষ্ঠ লক্ষ্যে ভারতবর্ষে কোনও রাজনৈতিক দল গঠিত হয়নি। কারণ

কংগ্রেস দিয়ে শুরু করে সব দলই নানান গুরুগম্ভীর কথা বলে খাতা খুলেছিল, তা পরে যত গোঁজিয়েই যাক। এখন একমাত্র পুরোহিতই ঠিক করবেন বলি দেওয়ার সময় শুরু করবেন কোনদিক থেকে— ল্যাজা না মুড়ো?

আমাদের উর্বর দেশে হাজার হাজার এমন রাজনৈতিক দল আছে যাদের উদয়-অস্তের খবর তেমন গুরুত্ব পায় না। কিন্তু তেমন একটি দল যদি একবার কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে এবং দ্বিতীয়বার একা একাই রাজ্যের সিংহাসনে বসে, তাদের তো আর এলেবেলে বলা যায় না। তবে যত জবরদস্তই হোক, সরকার বলতে তো শুধু দলটাকেই বোঝায় না— সে যতই শাসনক্ষমতা কবজা করার সুবাদে সরকারি নীতি প্রণয়ন করুক না। সরকারের ক্ষমতায় পরতে পরতে রয়েছেন নানান পরিচয়ের লোকলশকর— যাঁরা কেউই জনগণের রায়ে আসরে অবতীর্ণ হননি আবার সকলেই জনগণেরই অর্থে প্রতিপালিত— মুখ্যসচিব থেকে শুরু করে থানার কনস্টেবল। বইপত্তর পত্রপত্রিকায় পাওয়া যায় যে এঁরা সকলেই আইনকানুনের দ্বারা লিপিবদ্ধ প্রথায় কাজ করার জন্যই মাস গেলে মাইনে পান। কিন্তু এই পোড়া রাজ্যে আসলে কী হচ্ছে দেখা যাক।

শরীরে, মনে এবং পরিচয়ে বিধানচন্দ্র রায় এক বিরাট মানুষ ছিলেন। তিনি ঘনিষ্ঠ কয়েকজন অফিসারকে 'তুমি' সম্বোধনে কথা বলতেন— আবার শোনা যায় কেউ আপত্তি করলে সংশোধন করে নিতেন। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় শারীরিক দৈর্ঘ্যে এবং পরিচয়ে তাঁর কাছাকাছি হলেও সামগ্রিক বিচারে হয়তো অতটা বিরাট ছিলেন না। তিনিও মুষ্ঠিমেয় ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকেই মাত্র 'তুমি' সম্বোধন করতেন। আপাতদৃষ্টিতে জ্যোতিবাবু রাশভারী মানুষ হলেও কাউকে তুমি বলা দূরে থাক— সবকথাই ভাববাচ্যে এবং অসম্পূর্ণ বাক্যে সেরে নিতেন। তবে সহকর্মীদের নাড়িনক্ষত্র তাঁর নখদর্পণে থাকলেও তাঁদের ভালো করে না চেনার একটা ভান তিনি করতেন। এ সম্পর্কে তাঁর সচিবালয়ে কাজ করা আমার এক সহকর্মী বন্ধুর কাছে এমন একটি ঘটনা শুনেছি। এক সচিব সকালে একটা ফাইল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে গিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন ফাইলটা বিকেলে ফেরত নিয়ে যেতে। বিকেলে ফাইলের খোঁজে সচিব তাঁর ঘরে গেলে জ্যোতিবাবু স্বভাবসিদ্ধ অসম্পূর্ণ বাক্যে জানালেন— 'ওটা তো ও নিয়ে গেল'। ও-টা কে জানতে চাইলে উত্তর পেলেন 'ওই যে কালো মতো ছেলেটি এখানে আসে'। ঘর থেকে বেরিয়ে সচিবালয়ে খোঁজ করে জানা গেল ফাইলটি মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন মুখ্যসচিব এন কৃষ্ণমূর্তিকে। আর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তো ছিলেন পরিপাটি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। অথচ বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কাউকে 'আপনি' সম্বোধন করলেই সাংবাদিকরা তা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করে থাকেন। আর এখন তো দূরদর্শনের বিভিন্ন চ্যানেলের মহিমায় (নাকি বাধ্যবাধকতায়?) এলাহি সব প্রশাসনিক সভার মোড়কে মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক প্রচারে দেখতে পাই 'তুমি' সম্প্রদায়ের বাঘা অফিসার, নেতা-মন্ত্রীরা কেমন খাতাপত্তর হাতে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ধরাপড়ার জবাবে কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে কাঁপছেন। সেদিন তো সংবাদপত্রেই দেখলাম উর্দিপরা আই জি পি মুখ্যমন্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছেন।

এখন অবস্থাটা কিন্তু অশ্রুতপূর্ব এবং এতাবৎ অকল্পনীয়। তৃণমূল কংগ্রেস দলের সদস্যদের না হয় ছেড়েই দিলাম, কারণ ওটা তো আর দল নয় যে গণতান্ত্রিক ভাবে দলীয় সিদ্ধান্ত হবে— ওখানে 'সুপ্রিমো'ই সব কিছু। কাজেই হাতে মাথা নিতে আর কতক্ষণ? 'ল্যাম্পপোস্ট' পরিচয়টা তো গোড়াতেই জানা গেছে— এই কদিন আগে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো ভারিক্কি নেতাও বললেন, তিনিও নাকি বৃক্ষগাত্রে লতাসদৃশ। কিন্তু আমজনতার প্রশ্ন হলো হোমরাচোমরা রাজপ্রভুরা তো আর চাকরি বা বেতনের জন্যে তাঁর ওপর নির্ভরশীল নন—তাঁদের এমন দীনদরিদ্র হাল কেন? রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক পদে কাজ করার অভিজ্ঞতায় দেখেছি— নিয়মতান্ত্রিক ঠ্যাঁটা অফিসারকে সরিয়ে ঘাড় নাভাকে দিয়ে কাজ হাসিল করার বামফ্রন্টীয় অস্ত্র ছিল বদলি কারণ বদলির ব্যাপারে আদালতেরও করণীয় কিছু নেই। কিন্তু অপছন্দের অফিসারকে শায়েস্তা করার ফন্দিটা চালু ছিল না।

বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীই এটির আবিষ্কর্তা। নবান্নের অফিসারকে পাঠানো হলো মেখলিগঞ্জে— যিনি কিনা সদ্য পুরুলিয়া থেকে এসেছেন। হোমরাচোমরাও যে আজকাল মসৃণ ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়েন, তা ওই বদলির ভয়ে সবই তো 'রুটিনমাফিক'। এ প্রসঙ্গে সেদিন এক তরুণ অফিসার কৌতুকের ভঙ্গিতে বলছিলেন— মুখ্যসচিবকে বিডিও-র পদে বদলি করলে তিনি কী করবেন? CAT, High Court, Division Bench, Supreme Court পর্যায়ক্রমে সর্বত্রই তাঁর জয় অবশ্যম্ভাবী কিন্তু অফিসহীন, বেতনহীন, সাথীহারা অফিসার উপহাসের পাত্র হয়ে কতদিন লড়াই করবেন? কিন্তু ঘাড় নাড়া ব্যাপারটায় এত ঝামেলা নেই। দু'একজন করিতকর্মা কর্মচারী অবশ্য এমন আজগুবি বদলির পর আদালতে সফল হয়েছেন কিন্তু তাঁদের পিছনে কর্মীসংগঠনের সাহায্য ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছে, ওপরতলায় সেটা অনুপস্থিত।

বদলির চেয়েও ভয়ংকর 'Compulsory waiting'— এই কলে পড়লে মহাবিপদ। অফিস নেই, বেতন হবে বিশেষ নির্দেশে এবং সেই নির্দেশ বলে পে-বিল করানো এবং তার বলে মাইনে পাওয়া অনেক লম্ফঝম্ফের ব্যাপার। বামফ্রন্ট আমলেও প্রথাটা ছিল। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ প্রশাসনিক একটা সাময়িক বন্দোবস্ত যার সঙ্গে রাজনৈতিক প্রভুদের কোনও সংস্রবই ছিল না। কিন্তু বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এই কলটিকে প্রতিহিংসার ঘানি হিসেবেই ব্যবহার করছেন বেয়াড়া বেয়াদব অফিসারদের তেল বের করার উদ্দেশ্যে। এখন তাই প্রশাসনিক ব্যাপারে পরিচিত অফিসারদের সঙ্গে কোনো আলোচনা শুরু করতে গেলে তাঁরা না শোনার ভান করে ধোনির ভবিষ্যৎ ইত্যাদি প্রসঙ্গে চলে যান।

সংবাদমাধ্যমের আলোচনায় এবং বিশেষ করে বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের কথাবার্তায় প্রায়ই যে কথাটা শোনা যায় তাহলো রাজ্যে প্রশাসন বলে কিছু আর অবশিষ্ট নেই। কথাটা কতখানি সত্যি সেটাতো রাজ্যবাসী পদে পদে দেখতে পাচ্ছেন। শীর্ষ আমলা থেকে হরিপদ কেরানি, ডিজিপি থেকে থানার বড়োবাবু, উপাচার্য থেকে সাধারণ শিক্ষক, স্বাস্থ্য অধিকর্তা থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মী কাউকেই যদি বিধিনির্দিষ্ট কাজকর্ম করতে না দিয়ে সরকারের প্রধান থেকে শুরু করে 'অনুপ্রাণিত' শাসকদলের নেতা-কর্মীরা দাদাগিরি করেন, তাহলে প্রশাসন তার স্বাভাবিক গতিতে চলবে কী করে? সামনে আবার পুরসভা এবং তার পিছনেই বিধানসভার নির্বাচন। বর্তমান সরকারের যা রাজনৈতিক কাঠামো, তাতে অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। হয়তো ভবিষ্যতের কোনও সরকার এমন রাজনৈতিক দখলদারি পরিহার করে স্বচ্ছ, সুন্দর, স্বাভাবিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনবে এমন আশা করা ছাড়া রাজ্যবাসীর কীই বা করার আছে? ■

# বিদ্যাসাগরের অমর অবদানের কিছু কথা

**ডঃ অনিল চন্দ্র দাস**

১২২৭ বঙ্গাব্দের ১২ই আশ্বিন (১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর) হুগলী জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে (পরবর্তীকালে মেদিনীপুর) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ

করেন। তাঁর পিতৃদেব ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতৃদেবী ভগবতী দেবী অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও ধর্মপ্রাণা ছিলেন। তাঁর ঠাকুর্দা রামজয় তর্কভূষণ যথেষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করতেন। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য বীরসিংহগ্রাম পরিত্যাগ করে অর্থোপার্জনের জন্য কলকাতায় চলে আসেন। পিতার সঙ্গে কলকাতা আসার পথে ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজি লেখা মাইলস্টোন দেখতে দেখতে আসছিলেন। কলকাতায় এসে পিতাকে বললেন---আমি ইংরেজি সংখ্যা শিখে ফেলেছি। পিতা বললেন---তুমি তো ইংরেজি পড়োনি। পুত্র বলল, আমি রাস্তার পাশে লেখা দেখে শিখে ফেলেছি। তাঁর মেধাশক্তির পরিচয় এমনই অদ্ভুত ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্য ও কৈশোরকাল অতীব দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হলেও অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়নকার্যে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন। সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্যের জন্য মাসিক পাঁচ টাকার বৃত্তি লাভ করেন। ব্যাকরণ শ্রেণীর পাঠান্তে ইংরেজি শ্রেণীর অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সাহিত্য শ্রেণীতে বিশিষ্ট শিক্ষক জয়গোপাল তর্কালংকারের নিকট শিক্ষা অর্জন করেন। সংস্কৃত কলেজে তিনি বারো বছর অধ্যয়ন করেন এবং বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন আর কৃতিত্বের জন্য পুরস্কৃত হন। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে কৃতী অধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের অলংকার শ্রেণীতে অধ্যয়ন্তে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। তারপর বেদান্ত শ্রেণী এবং স্মৃতি শ্রেণীতে পাঠাভ্যাস সময়ে প্রখ্যাত পণ্ডিত হরনাথ তর্কভূষণ এবং শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির সহায়তায় অভাবনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রাপ্ত হন। সেইসঙ্গে পুরস্কার স্বরূপ ৮০টাকা অর্জন করেন। তৎপর ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'হিন্দু ল কমিটি'র পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তিনি কাব্য, অলংকার, বেদান্ত, স্মৃতি, জ্যোতিষ এবং ন্যায়শাস্ত্রে অর্জন করেন অগাধ পাণ্ডিত্য।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ক্ষীরপাইয়ের শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যা দিনময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যও খ্যাতিমান-শ্রদ্ধাবান প্রিয়ভাজন ছিলেন ওই অঞ্চলের জনসাধারণের নিকট।

১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেডপণ্ডিত (প্রধান অধ্যাপকের) পদে নিযুক্ত হন। জি. টি. মার্শাল সাহেব সেক্রেটারি ছিলেন ওই কলেজের। অল্পবয়সি বিদ্যাসাগর পাঁচ বছর ওই কলেজে দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন এবং ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর মাসিক ৫০ টাকা পারিশ্রমিকে সহকারী সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হন। জি. টি. মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরের ভূয়সী প্রশংসা করলেও বিদ্যাসাগর ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ওই পদ হতে পদত্যাগ করেন।

মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরের পদত্যাগের সংবাদে বিদ্যাসাগরকে তাঁর কলেজের করণিকের পদে নিযুক্ত করেন। বিদ্যাসাগর ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক পদে আসীন হন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে অধ্যক্ষের পদ শূন্য হলে ২২শে জানুয়ারি ১৫০ টাকা মাসিক বেতনে ওই পদে নিযুক্ত হন। কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁর অধ্যবসায়, কর্মনিষ্ঠা ও তৎপরতায় বিমুগ্ধ হয়ে তাঁর বেতন ৩০০ করে দেন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম

কলেজ তুলে দেওয়া হয়। সেখানে স্থাপিত হয় বোর্ড অব এগজামিনার্স। বিদ্যাসাগরকে বোর্ডের সক্রিয় সদস্যরূপে নিযুক্ত করে বিদ্যালয় সমূহের সহকারী পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত করা হয়। উচ্চ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় স্থাপন এবং 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো। বিদ্যাসাগর ওই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির সদস্য মনোনীত হলেন। তিনি পরে প্রতিষ্ঠানটির সম্পাদকের পদ লাভ করেন। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়টির নাম পরিবর্তন করে নূতন নামকরণ করা হয় 'হিন্দু মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন'। পরবর্তী সময়ে এখানেই গড়ে ওঠে 'বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়'। তিনি সাঁওতালদের জন্যও বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নারীশিক্ষার তিনিই পথিকৃৎ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি প্রধানত সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরেজি গ্রন্থ থেকে অনেক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর অনুদিত গ্রন্থের মধ্যে 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস' এবং 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' অতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা', 'বোধোদয়' এবং 'আখ্যানমঞ্জরী', 'সমগ্র সংস্কৃত ব্যাকরণ কৌমুদী' গ্রন্থসমূহ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার অপরিহার্য সহায়ক বলে পরিগণিত হয়ে আসছে। তিনি সমাজসংস্কারক ছিলেন। বাল্যবিধবা, বহু বিবাহ ও বিধবা বিবাহ প্রভৃতি নারীজাতির নিপীড়ন দুরাচার-দুর্গতির মোচন করাকে জীবনের অন্যতম ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জুলাই বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই দুর্নিবার কার্য সম্পাদন করার জন্য সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভীষণ সংগ্রাম করতে হয়েছে। শ্রুতি-স্মৃতি শাস্ত্রের বিধিবদ্ধ বিধানে সমূহ দ্বারাই যুদ্ধ করে রক্ষণশীলদের পরাভূত করেছেন। প্রত্যক্ষভাবে তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ করতেও দ্বিধাহীন ছিলেন। সমাজের অপসংস্কৃতি, নারী নির্যাতন দূরীকরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বিধবার সঙ্গে আপন পুত্রের বিবাহদানে তিনি এই আইনের বাস্তব প্রয়াসের নজির স্থাপন করেন।

প্রচলিত ধারণা অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা দান করলে পিতা-মাতার গৌরীদানজনিত পুণ্যোদয় হয়। নবম বর্ষীয়া কন্যাদানে পৃথ্বীদানের ফল লাভ হয়। দশমবর্ষীয়া কন্যাকে পাত্রস্থ করলে পরম পূতঃ লোক প্রাপ্তি হয় প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র প্রতিপাদিত কল্পিত ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হয়ে পরিণাম বিবেচনা না করে বাল্যবিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল। তজ্জন্য নিদারুণ অনর্থ সঙ্ঘটন হয়েছে, তা সর্বজনবিদিত। এরূপে লোকাচার ও শাস্ত্র পাশে বদ্ধ হয়ে দুর্ভাগ্যবশত বাল্যবিবাহ অশেষ ক্লেশ ও দুরপনেয় দুর্দশা ভোগ করায়। এ অবস্থার তীব্র যন্ত্রণা, তা দূরীকরণেই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের চরম সংগ্রাম। বাল্যবিবাহ অতিশয় নির্দয় ও নৃশংস কর্ম। বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহিতার মর্মবেদনা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে তা অপসারণে মহতীপ্রয়াস চালিয়ে সফলকাম হয়েছেন।

বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা, বিদ্যাসাগরের অভিমত ঃ 'শ্রুতি ও স্মৃতি' গ্রন্থগুলিতে পক্ষে ও বিপক্ষে নানাবিধ তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশিত। মনু-অত্রি-ভৃগু-পরাশর আদি স্মৃতিতে স্ত্রীলোকের পতি বিয়োগের পর ব্রহ্মচর্য ও পুনর্বিবাহ বিধবাগণের ধর্ম বলেও বিহিত বিদ্যমান আছে। ''মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্যং তদন্বারোহণংবা /শুদ্ধিতত্ত্বপ্রভৃতিধৃত বিষ্ণুবচন।'' অর্থাৎ বিধবারা স্বেচ্ছাক্রমে বিবাহ করতে পারেন। কিন্তু জোরপূর্বক বাল্যবিধবা কন্যাদের নির্মম কৃচ্ছসাধনাদি কার্যে বাধ্য করা যাবে না। তৎজন্য বিদ্যাসাগর সদ্য বিধবাদেরক বিবাহে কেবল উৎসাহিত করেননি, তাঁদের পুনঃ পতিগ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন। যেকোনো হিন্দু সমাজের পাত্র গ্রহণ করতে পারেন, অনুলোম-প্রতিলোমের নিষ্ঠুর বেড়াজালের ঊর্ধ্বে অভিমত পোষণ করেছেন বিধবাগণের পক্ষে।

সমাজপতিরা নির্দিষ্ট তত্ত্বের অপব্যাখ্যা করে সমাজপতিগণ বিধবাদের প্রতি পুনবিবাহের তথা সুষ্ঠুপুনর্বিবাহকরণের প্রতি নির্মম আঘাত সৃষ্টি করে সমাজ কলুষিত ও নারী নির্যাতন করেছেন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন বিধবা নারীর নির্যাতিত দশা উন্মোচন করেন তিনি। অতি দুঃস্থ পিতা-মাতারা বাধ্য হয়েই কন্যার জন্য অশীতিপর মৃত্যুপথগামী পতি গ্রহণে বাধ্য হতো। তারপর অত্যল্পকালমধ্য বৈধব্যদশা প্রাপ্ত বাল্যবিধবরা অবশিষ্ট জীবন রক্ষণশীল সমাজপতিগণের নির্দেশিত পথে নির্মমভাবে জীবলযাপনে বাধ্য করা হয় আর তাদের লাঞ্ছিত জীবনের অবসান ঘটান, পুনর্বিবাহ প্রদানের জন্য যাবতীয় বাধা দুরীকরণে বিদ্যাসাগর বদ্ধপরিকর হন। তাতে তিনি সফলকাম হন। বহুবিবাহ বিষয়ে কুলীনগণের প্রতারণাবাক্য সমাজে নির্মম আঘাত হানে। পতিহীনা সুশ্রী কন্যাকে পর্যন্ত বাড়িথেকে বহিষ্কৃত করেছে সমাজপতিরা। ফলে সমাজে ব্যাভিচাব. নেমে এসেছিল এক্ষেত্রেও ঈশ্বরচন্দ্রের অবদান অনবদ্য। অসহয়া বিধবাদের পুনর্বিবাহের প্রথা চালু করেছেন তিনি। বিধবারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত, সুষ্ঠু দাম্পত্যজীবন যাপনে সমাজকে কলুষমুক্ত করেছেন বিদ্যাসাগর।

শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য। স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ, বর্ণযোজনা প্রভৃতি অ-কার, আ-কার, ই-কার, ঈ-কার, উ-কার, ঊ-কার, ঋ-কার, এ-কার, ঐ-কার, ও-কার, ঔ-কার সংযোগ। অনুস্বার, বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু যোগ। সংযোগ বর্ণ—য ফলা, র-ফলা, ব-ফলা, ণ-ফলা, এ-ফলা, ম-ফলা, রেফ্, মিশ্রসংযোগ তিন অক্ষরে—ক, ষ, ণ = ক্ষ্ণ। ঙ, ক, ষ = ঙ্ক্ষ, ন, দ, র = ন্দ্র। ন, ন, য় = ন্ন্য। ম, ভ, র = ম্ভ্র। র, ধ, ব = র্ধ্ব। র, শ, ব = র্শ্ব। ষ, ট, র = ষ্ট্র।

১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইংল্যান্ডের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার তাঁকে 'সি. আই. ই' উপাধিতে সম্মানীত করলে দেশবাসীর নিকট ভূয়সী প্রশংসিত হন তিনি।১২৯৮ বঙ্গাব্দের ১৩ই শ্রাবণ, ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জুলাই তিনি পরলোক যাত্রা করেন।

***(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)***

# স্বামী বিবেকানন্দের পথে 'নতুন ভারত, বিজয়ী ভারত'

**তরুণ বিজয়**

ভারতের দক্ষিণপ্রান্তের শেষ শিলাখণ্ডে কন্যাকুমারীতে যেখানে তিন সাগরের জলরাশি শ্রীপাদ শিলার উপর অঙ্কিত দেবী কন্যাকুমারীর চরণ ধৌত করছে, সেখানে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের ভব্য মন্দির ও স্মারক তৈরি করা হয়েছে। আজও মানুষ দর্শন করে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। এই শিলাতে বসেই স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনদিন অখণ্ড সাধনা করেছিলেন। মা ভগবতীর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন— যাতে ভারত আবার নতুন উদ্যমে জেগে উঠে।

ওই স্থানে বিবেকানন্দের স্মৃতি জিইয়ে রাখার জন্য কীভাবে কাজ শুরু করা যায় তা নিয়ে অদ্ভুত ও অবিশ্বাসনীয় কাহিনি আছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক তথা তৎকালীন সরকার্যবাহ একনাথ রাণাডের মতো ব্যক্তিত্ব শুধু যে স্মারক নির্মাণের কথা ভেবেছিলেন তাই নয় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, শেখ আবদুল্লা ও করুণানিধির মতো বিপরীত মেরুর শীর্ষ নেতাদের সহযোগিতা আদায় করেছিলেন এবং তাদের উদ্‌ঘাটন সমারোহে শামিল হতে রাজি করিয়েছিলেন। ১৯৬৩-৬৪ সালের কথা, যখন কন্যাকুমারীতে স্থানীয় নাগরিকেরা ওই শিলাতে স্বামী বিবেকানন্দের স্মারক নির্মাণ করার জন্য সমিতি তৈরি করেছে, কিন্তু কাজের অগ্রগতি না হওয়ায় তারা তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর পরামর্শ চান। তিনি এই পরিকল্পনার গুরুত্ব বিবেচনা করে একনাথ রাণাডেকেই এই কাজের দায়িত্ব দিলেন। একনাথজী জানতেন এই কাজ বড়ো কঠিন। প্রথমেই তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দের আশীর্বাদ নিলেন। তখন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন কংগ্রেসের ভক্তবৎসলম্। মুখ্যমন্ত্রী জানতেন ওই শিলাতে স্থানীয় চার্চের কিছু লোক মা মেরী বা সেন্ট জেভিয়ারের মূর্তি লাগাতে চাইছে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন— যদিও ওই শিলার সঙ্গে স্বামীজীর সম্বন্ধ জড়িয়ে আছে, তবুও কারও মূর্তি বসাতে দেবেন না। বিবেকানন্দের মূর্তি বসানোর ব্যাপারে এটা বড়ো বাধা ছিল। একনাথজী তখনকার গৃহমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে নিজের সব পরিকল্পনার কথা বললেন। শাস্ত্রীজী বললেন— পরিকল্পনা ভালো, কিন্তু পণ্ডিত নেহরুর অনুমতি প্রয়োজন। আপনি যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান তাহলে কয়েকজন সাংসদের স্বাক্ষর-সহ আবেদনপত্র নিয়ে আসুন আমি দেখা করিয়ে দেব। একনাথজী কয়েকজন নয়, সমস্ত দলের সাড়ে তিনশো সাংসদের স্বাক্ষর-সহ আবেদনপত্র নিয়ে শাস্ত্রীজীর কাছে গেলে তিনি অবাক হন। শাস্ত্রীজীর এই পত্র পেয়ে নেহরু বললেন— অধিকাংশ সাংসদ যখন চাইছে তখন এটা দেশের সমস্ত লোকেরই ইচ্ছা।

এই খবর পত্রকার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ভক্তবৎসলম্ শুনে বললেন--- তিনি বিবেকানন্দের মূর্তি বসানোর বিরোধী নন, কিন্তু সুরক্ষা নিয়ে চিন্তিত। একনাথজী বুঝে গেলেন। ভক্তবৎসলমের সঙ্গে মাদ্রাজে গিয়ে দেখা করলেন এবং অনুমতি নিলেন। এই কাজে কাঞ্চীমঠের শঙ্করাচার্য, রাষ্ট্রপতি ড. রাধাকৃষ্ণণ, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মহম্মদ চাগলার মতো মহানুভব ব্যক্তিবর্গের সাহায্য ও সমর্থন পাওয়া গেল। নেহরুর দেহাবসানের পর শাস্ত্রীজী ও পরে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হলেন। শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে একনাথজী দেখা করলেন। তিনি খুবই আনন্দ প্রকাশ করে তখনকার মতো ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। একনাথজীর ব্যক্তিত্ব ছিল খুবই ও প্রভাবশালী। ইতিমধ্যে দ্রাবিড় নেতা আন্নাদুরাই ভেবেছিলেন সঙ্ঘের প্রচারক হিন্দু নেতা বোধহয় তার কাছে আসবে না, কিন্তু একনাথজী তার কাছে ও করুণানিধির কাছে গেলেন। সব নেতাই একটা কথা বলেছেন সঙ্ঘের সঙ্গে বৈচারিক মতভেদ থাকলেও বিবেকানন্দের কাজে তাঁরা সহযোগিতা করবেন। তারপরের প্রশ্ন— ধনসংগ্রহ। ভারতের প্রত্যেক রাজ্য একনাথজীর আবেদনে সাড়া দিয়ে ৫ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা সহযোগিতা করেছে। এমনকী জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা ও নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী তথা চার্চপন্থী হোকিশৌ সেমাও পর্যাপ্ত সহায়তা করেছেন। ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি মহাসমারোহে এই স্মারক উন্মোচন করেন। করুণানিধি স্বয়ং এসেছিলেন এবং শ্রীমতী গান্ধী শুভকামনা জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন— 'এই স্মারক উন্মোচনের পর এমন কিছু কাজ করবেন যা স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নকে সাকার করতে সাহায্য করবে।' একনাথ রাণাডে নতুনভাবে বিবেকানন্দ আন্দোলন সৃষ্টি করলেন ও শিলা স্মারককে মহান তীর্থে পরিণত করে বিবেকানন্দ কেন্দ্র স্থাপন করলেন।

একনাথজীর কল্পনা ছিল, এই বিবেকানন্দ কেন্দ্র ভবিষ্যতে এক কেন্দ্রীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করবে এবং বিশ্বে হিন্দু সভ্যতার প্রসারের সহায়ক হবে। তাঁর রূপরেখা অনুসারে দিল্লিতে বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন স্থাপন করা হয় এবং বর্তমান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল প্রথম প্রমুখ হিসেবে কাজ শুরু করেছে। এই বছর ২ সেপ্টেম্বর বিবেকানন্দ কেন্দ্রের নীতি নির্ধারক কার্যকর্তাগণ ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদ নিয়ে 'এক ভারত, বিজয়ী ভারত' বর্ষব্যাপী অভিযান সূচনা করেছেন। আমরা নিশ্চিত, বিবেকানন্দের শক্তি দ্বারা স্পন্দিত এই অদ্ভুত অভিযান নবযুবকদের নব উদ্যোগে 'নতুন ভারত, বিজয়ী ভারত' নির্মাণ করবে। ■

# একাত্তরের পর বাংলাদেশ থেকে কেউ নাকি ভারতে আসেনি

**সিতাংশু গুহ**

বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, ‘একাত্তরের পর বাংলাদেশ থেকে কেউ ভারতে যায়নি’। অসমে সদ্য ঘোষিত এন আর সি প্রসঙ্গে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ গাজিপুরে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই— একাত্তরের পরে বাংলাদেশ থেকে কেউ ভারতে যায়নি। যাঁরা গিয়েছেন তাঁরা আগেই গিয়েছেন। ওই দেশ থেকে যেমন এখানে এসেছে এখান থেকেও ওখানে গিয়েছে। কাজেই আমাদের চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই’। এ নিউজ ঢাকার অনেক মিডিয়ায় এসেছে। এটিকে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জোকস বলা যায়!

১৭ জুলাই ২০১৯ ওয়াশিংটনে বাংলাদেশি নারী প্রিয়া সাহা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বলেছেন, ‘বাংলাদেশ থেকে ৩৭ মিলিয়ন সংখ্যালঘু হারিয়ে গেছেন’। ২৯ জুলাই ২০১১-তে ওয়াশিংটনে এক হিয়ারিং-এ মার্কিন কংগ্রেসম্যান রবার্ট ডোল্ড বলেছেন, ১৯৪৭-র পর বাংলাদেশ থেকে ৪৯ মিলিয়ন সংখ্যালঘু মিসিং। ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. আবুল বারাকাত পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন যে, বাংলাদেশ থেকে ১৯৬৪-২০১৩ পর্যন্ত ধর্মীয় নির্যাতন ও বৈষম্যের কারণে ১ কোটি ১৩ লক্ষ হিন্দু দেশত্যাগ করেছেন। ২০১৬-তে তিনি আরও বলেছেন, ৩০ বছর পর বাংলাদেশে কোনো হিন্দু থাকবে না! এ মানুষগুলো ভারতে গেছেন।

অসমে এন আর সি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এন আর সি হবে? পুরো ভারতে এন আর সি হবে? আমেরিকা-ইউরোপ অবৈধদের খেদাচ্ছে, ভারত অবৈধদের খেদাবে সেটি তার অভ্যন্তরীণ বিষয়, বাংলাদেশের ভয় কী? আর খেদিয়ে দেয়া কি একই সহজ? বাংলাদেশ কি পারছে রোহিঙ্গাদের বিদায় করতে? বা রোহিঙ্গারা কি যেতে চাচ্ছে? মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি অনুযায়ী কারোও ভারতে আমার কথা নয়, কিন্তু এসেছে। ১২ আগস্ট ২০১৮-তে ‘ডেইলি স্টার’ পত্রিকা অসমে এন আর সি প্রসঙ্গে ‘দি টাইমস অব ইন্ডিয়া’ পত্রিকা নরেন্দ্র মোদীর একটি উদ্ধৃতি ছেপেছে, যাতে মোদী বলেছেন, ‘অবৈধ অভিবাসী ঠেকানো ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির অঙ্গীকার ছিল’।

ঠিক কত মানুষ ভারতে এসেছেন তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। কেন এসেছেন, তা সবার জানা। বহুবিধ উপায়ে অত্যাচারিত হলেই কেবল মানুষ জন্মভূমি ছাড়তে বাধ্য হয়। বাংলাদেশ সরকার ‘অর্পিত/শত্রু সম্পত্তি’ তফশিল ‘ক’ ও ‘খ’-তে অগুন্তি সংখ্যক হিন্দু মিসিং নাম ছাপিয়েছেন। এক একটি নাম অর্থাৎ এক একটি পরিবার। এরা ভারতে চলে গেছেন বলেই তো তাদের সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হয়েছে। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের হিসাব অনুযায়ী এই জমির পরিমাণ ২.৮ মিলিয়ন একর। পরিমাণটি আসলে আরও বেশি। এই সম্পত্তি সরকার হিন্দুদের থেকে নিয়ে মুসলমানদের দিয়েছে। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর আইনটি বাতিল হয়েছে, সংখ্যালঘুরা সম্পত্তি বা ক্ষতিপূরণ পাবে কবে?

১৯৪৭ সালে আদমশুমারি অনুসারে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জনসংখ্যা ছিল ১৯.৭ শতাংশ। ২০১১-এ আদমশুমারি অনুযায়ী সেই সংখ্যাটি নেমে হয়েছে ৯.৭ শতাংশ। এরপর বাংলাদেশে এখনো কোনো আদমশুমারি হয়নি। পিটিআই ২৩ জুন ২০১৬ ঢাকা থেকে এক রিপোর্টে বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিক্স-এর (বিবিএস) পরিসংখ্যান ‘কোট’ করে বলেছে, ২০১৫-র শেষে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৫.৮৯ কোটি, এর মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা বেড়ে ১.৭০ কোটি হয়েছে, যা ১০.৭ শতাংশ। পিটিআই প্রশ্ন করেছে, ২০১৪ সালে বিবিএস পরিসংখ্যান অনুযায়ী হিন্দু’র সংখ্যা ছিল ১.৫৫ কোটি, মাত্র এক বছরে সেটি বেড়ে ১.৭০ কোটি হলো কী করে? বিবিএস বলেছে, ‘রান্ডম স্যাম্পলিং’ করে তাঁরা হিন্দু সংখ্যা বৃদ্ধির পরিসংখ্যান দিয়েছেন।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা বাধ্য হয়ে দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন, এটি দিবালোকের মতো সত্য। কেন তারা দেশত্যাগ করেছন? এর সোজা উত্তর হিন্দুদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে, দেশ স্বাধীন হওয়ায় তারা ফিরে আসেন। আবার দেশত্যাগ করতে হবে জানলে কি তারা ফিরতেন? তাঁরা না ফিরলে কী হতো? বাংলাদেশের হিন্দুরা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের কারণে। এই নির্যাতন সামাজিক, ধর্মীয় এবং সরকারি পর্যায়ে? সব সরকারের আমলে কমবেশি এই নির্যাতন চলছে। ২০০১-এর পর আওয়ামি লিগ সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়ে ব্যাপক সোচ্চার ছিল। কিন্তু ক্ষমতায় এসে তারা নির্যাতন বন্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে অত্যাচার অব্যাহত আছে, দেশত্যাগ চলছেই।

ডেইলি স্টার রিপোর্ট অনুযায়ী মানবাধিকার নেত্রী সুলতানা কামাল ৯ আগস্ট ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, ‘গভর্নমেন্ট ফেইল্ড টু প্রটেক্ট এথনিক মাইনরিটিজ’। তিনি অভিযোগ করেন, ‘আমরা এখন বলতে পারি দেশ থেকে একটি সমাজকে বিতাড়িত করার পাঁয়তারা চলছে’। তার অভিযোগ, সরকার এবং সরকার সমর্থিত গোষ্ঠী এটি করছে। একই পত্রিকা ২০ নভেম্বর ২০১৬ অধ্যাপক আবুল বারাকাতের একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানের নিউজ ছেপেছে। যেখানে অধ্যাপক বারাকাত বলেছেন, ‘৩০ বছর পর বাংলাদেশে কোনো হিন্দু থাকবে না’। তিন দশকের গবেষণার ফলাফল হিসাবে ড. বারাকাত দেখিয়েছেন, স্বাধীনতার পূর্বে দেশত্যাগের হার ছিল প্রতিদিন ৭০৫ জন। ১৯৭১-১৯৮১ পর্যন্ত তা ছিল ৫১২ জন; ১৯৮১-১৯৯১-এ সেটি দাঁড়ায় ৪৩৮ জন। কিন্তু ১৯৯১-২০০১-এ এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭৬৭ জন এবং ২০০১-২০১২-এ ৭৭৪ জন।

মানবতার এই অপমান বন্ধে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ কখনো ছিল না, এখনো নেই।

*(লেখক নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশি)*

# চিঠিপত্র

## মোদীজীর নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক অখণ্ড ভারত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে

ভারতের একশো পঁচিশ কোটি জনতার মুখে সবসময় মোদীজীর কাজের প্রশংসা ও সমালোচনা হচ্ছে। যেসব পদক্ষেপগুলি মোদীজীর সময়ে নেওয়া হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ চলছে। এন আর সি, ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি, নোটবন্দি, রাফাল, সার্জিকাল স্ট্রাইক, তিন তালাক বাতিল এই সমস্ত মোদীজীর সময়ে সঠিক পদক্ষেপ। আমরা সমর্থন করছি, কারণ এতে দেশের ভালো হবে। সকলের ভালো হবে। এই গণতান্ত্রিক দেশে আমরা সব ভারতবাসী চাই সুস্থভাবে বাঁচতে, সম্মান নিয়ে বাঁচতে, পুরুষ ও নারী উভয়েই স্বাধীনতা সমান চাই, শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি হোক, জীবনজীবিকায় সকলের সমান প্রাপ্য নির্ধারিত হোক, শিশু ও নারী পাচার বন্ধ হোক, নারীধর্ষণ বন্ধ হোক, অনুপ্রবেশ বন্ধ হোক, জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি বন্ধ হোক, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন হোক, প্রতিবেশী দেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার বন্ধ হোক ইত্যাদি।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে যেসব হিন্দু ভারতে ঢুকছেন তাঁদের অসুবিধার কথা শুনে শীঘ্রই ব্যবস্থা নিক ভারত সরকার। এদিকে বাংলাদেশে হিন্দুরা অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এদেশে পালিয়ে আসছেন তাদের শরণার্থীর তকমা সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হোক। আমরা জানি জনসংখ্যার ভারে নুইয়ে পরা ভারতবর্ষে আজ থেকে নয়, কংগ্রেস শাসনকাল থেকে চলছিল অবৈধ অনুপ্রবেশ যা আজকে আমাদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অসমে এন আর সি প্রকাশে অবৈধ অনুপ্রবেশের প্রমাণ মিলেছে। ভারতবর্ষ মোগল- পাঠানদের ও ব্রিটিশদের দখলে বহুকাল ছিল। ভারতবর্ষে দ্বিতীয়বার মোগল-পাঠান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা যাতে না হয় সেইজন্যই এন আর সি। বাংলাদেশে নির্বিচারে হিন্দুদের মেরে ফেলা হচ্ছে এই খবর কি কংগ্রেস ও তৃণমূলিরা রাখেন? কিন্তু তার আঁচ প্রকৃত জাতীয়তাবাদীরা বুঝতে পেরে গেছে। মোদীজী ও অমিতজীর তাই তড়িঘড়ি এন আর সি-র উদ্যোগ।

সীতারাম ইয়েচুরি ও রাহুল গান্ধীরা না বোঝার ভান করছেন। এন আর সি ও ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ, মিছিল ও জনসভা করে ভুল বোঝানো হচ্ছে। এই নিয়ে শোরগোল হচ্ছে বিরোধী শিবিরে। এরা চেষ্টা করছে, প্ররোচনা দিচ্ছে যাতে মোদীজীর বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও জোরালো করা হয়। সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, বসপা, সপা ও অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলি সব সাপে-নেউলে একত্র হয়ে বিজেপিকে হটানোর চেষ্টা করছে।

অধীরবাবুর মতো আরও যাদের পূর্বপুরুষেরা বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে ভারতে এসেছেন তাদের পরবর্তী প্রজন্মেরা কেন বাংলাদেশে ছেড়ে আসা পৈতৃক ভিটেমাটি পুনরুদ্ধারের জন্য যাচ্ছেন না? অধীরবাবুর বাবা কেন বাংলাদেশ ছেড়ে এদেশে এসেছিলেন, তিনি তাঁর বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কখনো? এতো দরদ কেন অনুপ্রবেশীদের জন্য? মমতা, বুদ্ধদেব, সূর্যকান্ত, অধীরবাবুদের মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিরা শুধুই ভোট ও গদির স্বার্থে অনুপ্রবেশীকারীদের পক্ষপাতিত্ব করেন। এদের রাজনীতি রাজ্যের মানুষ বুঝে গেছেন।

তাই আর নয় কংগ্রেস, আর নয় বামফ্রন্ট, আর নয় তৃণমূল। আমরা চাই মোদীজীর সরকার আমরা চাই অমিতজী ও আদিত্যনাথজী, মোহন ভাগবতজীর মতো আদর্শবাদী পুরুষ। আমরা চাই আদবানিজীর মতো লৌহপুরুষ। আমরা চাই রাজ্যে দিলীপ ঘোষের মতো নির্ভয়, সাহসী নেতা। এছাড়া আমরা গভীরভাবে স্মরণ করি অটলজী, অরুণ জেটলি, অনন্ত কুমার, সুষমা স্বরাজ, মনোহর পারিকরজীর মতো নেতাদের যাঁদের অবদান ভোলার নয়। আমরা মনে করি নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক অখণ্ডভারত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। এই প্রক্রিয়া নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরেই শুরু হয়েছে তার কিছু নমুনা এই কয়েক বছরে অবশ্যই উপলব্ধি করতে পেরেছি।

—**রাজু সরখেল,**
দিনহাটা, কোচবিহার।

## দুর্গাপূজাই বাঙ্গালির জাতীয় উৎসব

কী নেই দুর্গাপূজায়? শক্তি সাধনার পীঠস্থান বঙ্গপ্রদেশের সেরা উৎসব দুর্গাপূজা। শক্তি পূজার স্থলে ব্যক্তিপূজা প্রচলন হওয়ায় মন্ত্র, তন্ত্র সাধনা ও দর্শন তত্ত্ব আজ বাঙ্গালি জীবন থেকে উধাও। সেই সঙ্গে উধাও সুখ শান্তি, সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি। তবু যেটুকু উৎসবের নামে আছে, দেখি, তা থেকেও আমাদের পাওনা কতটুকু।

আমাদের জনজাতি সমাজের সব অস্ত্রই মা দুর্গার হাতে, যিনি মহিষাসুর নামে এক দানবকে দমন করছেন। অর্থাৎ আসুরিক শক্তিকে দমন করতে গেলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দানব মরে যায়নি কিন্তু দমিত আছে। গাছের সঙ্গে আগাছা জন্মায়, উপকারী জীবজন্তুর সঙ্গে বিষাক্ত জীবজন্তু কীটপতঙ্গ জন্মায়। দৈবচিন্তায় অভ্যস্ত মানুষের সঙ্গে দানবীয় চিন্তার মানুষও জন্মাবে–- এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। চিন্তাশীল মানুষ অনবরত আগাছা সরিয়ে গাছ রক্ষা করবে, বিষাক্ত কীটপতঙ্গ সরিয়ে জীবজন্তু রক্ষা করবে, দুষ্কৃতকারী দানব বিনাশ করে সমাজকে রক্ষা করবে— এটাই হিন্দু শাস্ত্রের শিক্ষা। তার জন্যই ঐক্যবদ্ধ হওয়া। এই সমাজে চাই সত্যরক্ষায় কঠোর ত্যাগী বুদ্ধিমান যুবশক্তি --- গণেশ। চাই সুকৌশলী

যোদ্ধা—কার্তিক। চাই সংযম ও ব্রহ্মচর্য পুষ্ট বিলাসিতাহীন শিক্ষানুরাগী--- সরস্বতী। সুসংহত অর্থ বিভাগ— লক্ষ্মী। সঙ্গে চাই— খাদ্য, ঔষধীয়, ফল ফুলের ব্যাপক চাষ— নবপত্রিকা। সবার উপর এমন একজন চাই--- যিনি সমাজের রোগ-শোক, মান-অভিমান, কুৎসা-অপমান ক্রমাগত শোষণ করে, আত্মসাৎ করে, সমাজকে দেবেন কঠিন, কঠোর দিব্য প্রেরণা--- নীলকণ্ঠ শিব।

আমাদের শস্ত্রকাররা জানতেন, দর্শন হয়তো একসময় চাপা পড়ে যাবে, কিন্তু মূর্তির জনপ্রিয়তা কোনদিন উঠে যাবে না। একদিন যা ছিল রাজা ও ঋষিদের তপস্যা ও সাধনার ক্ষেত্র, আজ সেটা সমগ্র সমাজের আনন্দ উৎসব ও উৎকৃষ্ট অর্থনীতির প্রয়োগক্ষেত্র রূপ পেয়েছে বারোয়ারি পূজা ও মেলায়।

প্রতিমা, মণ্ডপ সজ্জা, আলোর কাজে নয়ন মনোহর শিল্প কাজে যুক্ত থাকেন হাজার হাজার শিল্পী। নবপত্রিকা স্থাপন, মহাস্নান, ঘটস্থাপন, প্রাণ প্রতিষ্ঠা, পূজা, আরত্রিক, যজ্ঞে নিযুক্ত হাজারো পুরোহিত, চণ্ডীপাঠক, পূজাকর্মী, ঢাকি, নাপিত সরাসরি যুক্ত থাকেন। এছাড়া আছেন মাটির হাড়িকুড়ি, বেনে দ্রব্য, ফলফুল, দূর্বা, বেলপাতা, পঞ্চপল্লব, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, মিষ্টান্ন, ভোগ, দুধ, ঘি, বস্ত্র, হোম দ্রব্যাদির হাজারো সামগ্রীর জোগানদার। প্রথানুযায়ী নতুন জামাকাপড় পরার ক্ষেত্রে বস্ত্রশিল্পে, ব্যবসায়ে যুক্ত লোকের সংখ্যাও কম নয়। সারা বছরের জমানো অর্থ, অতিরিক্ত বোনাস, টিপস্ সবই ব্যয় হয় পূজার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত মেলায়। কী নেই এই মেলায় যা কেনাকাটা হয় না। পরিবহণ শিল্পে নিযুক্ত লোকেরাই বা কম যায় কোথায়। চাঁদা তোলা, চাঁদা দেওয়া, প্রসাদ বিতরণ, বস্ত্র বিতরণ, খাওয়া-দাওয়া— কে বাদ পড়ল বলুন তো? হ্যাঁ সেই, যে এতবড় জাতীয়তাবোধকে শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সঙ্গে মেনে না নিয়ে শুধু নিজের স্বার্থ ও আয়ের সুযোগটুকু নিল, পরোক্ষে এই সমাজকেই নানান ভাবে ক্ষতবিক্ষত করার কাজই করে গেল আমাদের সরলতা ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে। তারাই অসুর, মহিষাসুর, দানব। এই দানবশক্তিকে দমিত করার জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রকাশ করতে হবে সিংহবিক্রম। স্মরণ করতে হবে নীলকণ্ঠ শিবের মতো ঋষি- যোগীদের। লক্ষ্মী, সরস্বতীকে রক্ষা করার জন্য কার্তিক-গণেশদের তৈরি থাকতে হবে। ষষ্ঠীর বোধনে উদ্বুদ্ধ হয়ে মহাস্নান থেকে হবন আদি ক্রিয়ার মাঝে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর সন্ধিক্ষণ ও সংকল্প, বলিদান মনে করিয়ে দেয় প্রাকৃতিক নিয়মে, গ্রহনক্ষত্রের সংযোগে 'সময়'ই— কোনো এক দশমীতে বিজয় এনে দিতে পারে 'বিজয়া'। চণ্ডীপাঠে, এমন অজস্র যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আদর্শ, নীতি ও লক্ষ্যে অবিচল থেকে বছর বছর ধরে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে, শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। লাখো টাকার এমন মনোহর মূর্তির বিসর্জন, আমাদের মনে করিয়ে দেয় মূর্তিতে মোহ নয়, শক্তি চর্চাই মূল উদ্দেশ্য। সংসার- সন্তান-অর্থ উপার্জনে, ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়-গোষ্ঠীতে মোহগ্রস্থ না থেকে প্রাচীন এই আর্যাচারকেই অনুশীলন করতে হবে, অবলম্বন করতে হবে--- সেটাই হবে আমাদের সার্থক জাতীয় উৎসব।

**—শঙ্করপ্রসাদ পাহাড়ী,**
কাঁথি, পূর্বমেদিনীপুর।

## শত-শত বর্ষ থাকুক

স্বস্তিকাতে অনেক চিঠিপত্র লিখেছি। স্পষ্টকথা, স্পষ্ট ভাষায় বলা থেকে এ পত্রিকা কোনোদিন বিরত থাকেনি। 'খোলাচিঠি' বিভাগে, সুন্দর মৌলিকের লেখা খুবই ভালো লাগে, ভালো লাগে সম্পাদকীয়। এ পত্রিকায় লিখে প্রীতি ও গর্ব অনুভব করি। ৭২ বছরের প্রথমসংখ্যা পাঠ করলাম শত শত বছর চলুক এই পত্রিকা--- এই আমার কামনা রইল।

'ভালেতে দিলাম জয়টিকা,
প্রিয় পত্রিকা স্বস্তিকা'।

**—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়,**
পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৬

## ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে

কাশ্মীরে ৩৭০ ও ৩৫এ ধারা বাতিলে বর্তমান মোদী সরকারের গৌরবময় অবস্থান স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে বীর শহিদ ড. শ্যামাপ্রসাদকে। যাঁর দৃঢ় ব্যক্তিত্ব প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও স্পষ্ট বক্তব্য ছিল— স্বাধীনতার অর্থ হলো--- পূর্ণগণতন্ত্র ও সকলের সমমর্যাদা। ড. শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু রহস্য সত্ত্বর উদ্‌ঘাটিত হোক। তাঁর বক্তব্য ছিল— এক বিধান, এক নিশান, এক প্রধান। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

কিন্তু কংগ্রেসের অদূরদর্শিতা ও মুসলমান প্রীতিতে তা না হয়ে ৩৭০ ও ৩৫এ ধারা কার্যকরী করে। বর্তমানে ৩৭০ ও ৩৫এ ধারা বাতিল করায় বিরোধী কিছু নেতৃত্বের বক্তব্য পাকিস্তানকে উস্কিয়ে দিচ্ছে। তারা বলছেন 'কাশ্মীর মুসলমান প্রধান রাজ্য না হতো এটা হতো না', 'কাশ্মীর একদিন হাত ফসকে বেরিয়ে যাবে', 'কাশ্মীরের অধিকার কেড়ে নিয়ে কাশ্মীরকে প্যালেস্টাইন বানাতে চাইছে'। উক্তিগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়— কাশ্মীর থেকে ছয় লক্ষ হিন্দুদের ঘরছাড়া করা। খুন ও ধর্ষণের ঘটনাগুলি। জনপ্রিয় নেতা টিকালালকে খুন, বিচারপতি লীনকণ্ঠগঞ্জকে খুন। ৩৭০ ও ৩৫এ ধারায় বিশেষ মর্যাদায় থেকেও ৭০ বছরে ৮০ হাজরেরও বেশি সেনার আত্মবলিদান, বিমান ছিনতাই করে জঙ্গিমুক্তি মুম্বই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ও বহু জঙ্গি ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটেই চলছে। অন্য রাজ্যের নাগরিকদের চেয়ে মাথাপিছু দ্বিগুণ অর্থ বরাদ্দ পেয়েও পাথরবাজের মতো অশান্তি বর্তমান, এটা কী প্যালেস্টাইনের চেয়ে কিছু কম। জঙ্গিহিংসা মুক্ত শুধু দেশ নয়, জঙ্গিহিংসা মুক্ত পৃথিবী গড়তে, মোদী সরকারের সাফল্যে--- ''ভারত আবার বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

**—রবীন্দ্রনাথ রায়,**
সাহেবের হাট, কোচবিহার।

# রাজবংশী সমাজে নারীর স্থান

**অনিতা ইশোর বর্মণ**

রাজবংশী সমাজে 'কন্যাপণ' বলে একটা প্রথা বিদ্যমান। অন্য জনজাতির তুলনায় উত্তরবঙ্গে রাজবংশী জনজাতি সর্বাধিক। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙের সমতল এলাকা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলায় এদের বসবাস। উত্তরবঙ্গে মোট ৭৭.১৯ শতাংশ রাজবংশী সমাজের মানুষ বাস করেন।

উত্তরবঙ্গে রাজবংশীরাই অধিকাংশ জমির মালিক। স্বাধীনতার পরে উত্তরবঙ্গে জনসংখ্যার আমূল পরিবর্তন হয়। রাজবংশী ছাড়া অ-রাজবংশী, মাড়োয়ারী জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশ রাজবংশী সম্প্রদায় কৃষি নির্ভর, তাই গ্রামেই বাস। রাজবংশী সমাজের পরিবার সাধারণত পিতৃতান্ত্রিক।

রাজবংশী সমাজে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের ভূমিকা বেশি। একজন কর্মঠ রাজবংশী মহিলাকে সম্পত্তি হিসেবেই গণ্য করা হতো। রাজবংশী মহিলাদের চিড়া, মুড়ি বানানো থেকে সন্তান সন্ততি, গৃহপালিত পশু দেখভাল করা প্রভৃতি স্বাভাবিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। পরিবারের কাজকর্ম ছাড়া মাঠে পুরুষদের সঙ্গে বীজবোনা, আগাছা ছাড়ানো, চারাগাছ লাগানো, শস্য মারাইয়ের কাজ করতে হতো। রান্নার কাঠ সংগ্রহ থেকে শস্য বিক্রয়ের জন্য হাটে বাজারে যেতে হতো। রাজবংশী মহিলারা সমাজের অন্যান্য মহিলাদের তুলনায় অধিক স্বাধীনতা ভোগ করে।

সাম্প্রতিককালে কৃষিকাজ, নির্মাণ কাজ ও অন্যান্য অসংগঠিত ক্ষেত্রে রাজবংশী মহিলারা দিন মজুরের কাজ করে। তবে পুরুষের তুলনায় কম মজুরি জোটে। এ থেকে রাজবংশী মহিলাদের লোয়ার স্টেটাস-এর প্রমাণ মেলে।

রাজনৈতিক ও অন্যান্য সংগঠনের ক্ষেত্রে রাজবংশী মহিলারা গুরুত্ব পান না। সেক্ষেত্রে পুরুষরাই নিয়ন্ত্রণ করেন। শিক্ষার হার নগণ্য, তাছাড়া অন্যান্য পারিপার্শ্বিক ক্রিয়াকলাপ থেকে অত্যন্ত দূরে থাকায় রাজবংশী মহিলারা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সচেতন নয়। তার জন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অংশ গ্রহণ নেই বললেই চলে।

রাজবংশী সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা খুবই নগণ্য। রাজবংশী শিক্ষিত সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ কদাচিৎ ঘটে। বাল্যবিবাহ রাজবংশী সমাজে এক পুরানো ঐতিহ্য। নারীদের বিবাহ বাধ্যতামূলক। রাজবংশী সমাজে অবিবাহিত মহিলা কদাচিৎ লক্ষ্য করা যায়। পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে রাজবংশী সমাজে বিবাহ হয়। সাধারণত রাজবংশী সমাজে বহু বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে রাজবংশী সম্প্রদায়ের কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। যথা—মহিলাদের অধিকার, আইন, সমাজ চেতনা ও সামাজিক কর্তব্য প্রভৃতি।

উত্তরবঙ্গে গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের রাজবংশী নারীরা লৌকিক দেবী বিষহরি পূজার অনুষ্ঠান করে থাকে। মহিলারা পরিবার ও সমাজের মঙ্গল কামনায় 'মেছেনি মেলা'র অনুষ্ঠান করে থাকে।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতিতে বিবর্তন ধারার প্রভাবে অনেক পরিবর্তন হলেও প্রাচীন ঐতিহ্য পালনে মাতৃতান্ত্রিক ভাবধারা এখনো প্রচলিত। রাজবংশী নারীদের ব্রতকথাগুলি আজও সমানভাবে অনুষ্ঠিত হয়। লৌকিক দেবী ভাণ্ডানী, বিষহরি, সুবচনী, কালিঠাকুরাণী, কাত্যায়ণী, বাটেশ্বরা, ক্ষেতিলক্ষ্মী, তিস্তাবুড়ি, হুদুমদেও প্রভৃতি ব্রত উদ্‌যাপন করে। কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের নারীরা মনের আকুতি জানার পথ খুঁজে পায়। সংকল্প পূরণের জন্য দেবদেউলে, মানত করা, অলৌকিকতায় বিশ্বাসী, তুকতাক্, ঝাড়ফুক, গাছের শেকড়-বাকর, কবচ ধারণ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের বশে সম্পাদন করে। ভাওয়াইয়া লোকসংগীতে পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে রাজবংশী মেয়েরাও দক্ষতার ছাপ রাখতে শুরু করেছে। কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের রাজবংশী নারী সমাজের এই মাতৃভাবনা লোকসংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রকে যে গভীর ভাবে আবৃত করে রেখেছে।

স্বাধীনতার ৭২ বছর পেরিয়ে গেলেও রাজবংশী সমাজের মেয়েদের বিকাশ তেমন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। রাজবংশী মহিলাদের সশক্তিকরণের জন্য ভারত সরকারের সময়োপযোগী পরিকল্পনা আবশ্যক। তা না হলে রাজবংশী নারীসমাজ সেই তিমিরেই রয়ে যাবে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। ■

# শ্বাসকষ্ট, কাশি ও অ্যালার্জি থেকে সাবধান

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জি যেমন— ধুলোবালি, ধোঁয়া, ফুলের রেণু, কলকারখানার নির্গত বিষাক্ত গ্যাস, গাড়ির ধোঁয়া, বিশেষ কিছু খাবার, ওষুধ অ্যালার্জি ও অ্যাজমার সৃষ্টি করে। যে কোনো সুস্থ ব্যক্তির অ্যালার্জি হতে পারে। সামান্য উপসর্গ হতে শুরু করে মারাত্মক উপসর্গ সৃষ্টি করতে পারে এমনকী হঠাৎ তীব্র আকারে আক্রমণ করতে পারে। নিউইয়র্কে গবেষকরা বলেছেন, বিভিন্ন যানবাহন রাজপথে হাঁচি উদ্রেককারী অ্যালার্জেন সৃষ্টি করে। কালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির মতে, প্রস্তরফলক, ইস্টক প্রভৃতি দ্বারা আস্তরণ করার সময় বিভিন্ন উৎস হতে কমপক্ষে ২০টি অ্যালার্জেন পাওয়া যায়। ফুটপাথের ধূলিকণাকে বর্ণনা করেন এভাবে যে এগুলো হচ্ছে মৃত্তিকার ধুলো, গাড়িতে গচ্ছিত নিঃশোষিত পদার্থ টায়ারের ধুলো এবং অন্যান্য যৌগিক পদার্থের জটিল সংমিশ্রণ। শহরবাসী অ্যালার্জি ও অ্যাজমার ধুলা প্রবল ভাবে গ্রহণ করে। কারণ রাজপথ দিয়ে চলাচলকারী যানবাহন, লোকজন প্রভৃতির মাধ্যমে এগুলো দ্রুতবেগে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। তাদের মতে শতকরা ১২ ভাগ শহরবাসী নিঃশ্বাসের সঙ্গে এমন বায়ুবাহিত অ্যালার্জেন গ্রহণ করে। গবেষকদের মতে, রাজপথের খুব নিকটতম বসবাসকারীদের পথের ধুলোর সম্পর্কযুক্ত অ্যালার্জি ও অ্যাজমার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি এবং রাস্তার ১০০ মিটারের মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের মধ্যে কাশি, হুইজ, রানিংনোজ এবং নির্ণীত অ্যাজমার প্রকোপ অধিক। অ্যাজমা এবং অ্যালার্জি নিঃসন্দেহে একটি যন্ত্রণাদায়ক স্বাস্থ্য সমস্যা। তাই অ্যালার্জি ও অ্যাজমা যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। অ্যালার্জির সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। কী কারণে এবং কোন কোন খাবারে আপনার অ্যালার্জি হতে দেখা দেয় তা শনাক্ত করে পরিহার করলে অ্যালার্জি হতে রেহাই পাওয়া সম্ভব। অ্যালার্জি সৃষ্টি হয় তখন যখন ইমিউনোগ্লোবিন-ই-র পরিমাণ বেড়ে যায়। যার ফলে অ্যালার্জেন অ্যান্টিবডির বিক্রিয়ার পরিমাণ বেশি হয় এবং এই বিক্রিয়ার ফলে নিঃসৃত হিস্টামিনের পরিমাণ বেশি হয় যা অ্যালার্জি সৃষ্টি করে। সংক্ষেপে ধুলোবালি, ধোঁয়া, গাড়ির বিষাক্ত গ্যাস, কলকারখানার সৃষ্ট পদার্থ, বৃষ্টিতে ভেজা, শীতের কুয়াশা, ফুলের রেণু, বিশেষ কয়েকটি খাবার যেমন চিংড়ি, ইলিশ, বোয়াল, গাজর, মাংস, হাঁসের ডিম, পাকা কলা, আনারস, নারিকেল, কসমেটিক ও অগণিত জানা-অজানা জিনিস আমাদের শরীরে কাশি, শ্বাসকষ্ট, অ্যালার্জি ও অ্যাজমার সৃষ্টি করতে পারে।

**অ্যাজমা বা হাঁপানি :**

দীর্ঘদিন ধরে শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ এবং তার প্রতি সংবেদনশীলতাই অ্যাজমা বা হাঁপানি। এর উপসর্গ হিসেবে দেখা দেয় হাঁচি, কাশি, বুকে চাপা ভাব, শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণে বাধা।

## হাঁপানির কারণ :

বংশগত এবং পরিবেশগত কারণে হাপানি হলেও এ দুটি উপাদক কীভাবে সৃষ্টি করে তা পরিষ্কার ভাবে জানা সম্ভব হয়নি। তবে প্রদাহের কারণে শ্বাসনালী লাল হয়ে যায়, ফুলে যায়, সরু হয় এবং ইরিটেন্ট বা উদ্দীপকের প্রতি সংবেদনশীল হয়, যার ফলে হাঁপানির উপসর্গসমূহ দেখা যায়। নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন উপাদকের কারণে হাঁপানির উপসর্গসমূহ সাধারণ দেখা যায়।

## হাঁপানির উপসর্গের উপাদক (ট্রিগার) সমূহ :

- ইনফেকশন, সাধারণত ভাইরাস জনিত উপসর্গ। যেমন— কোল্ড, ফ্লু ইত্যাদি।
- অ্যালার্জেন, বিশেষত ধুলোবালি, পরাগরেণু, গৃহপালিত পশুপাখির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ ইত্যাদি।
- ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম বিশেষত শীতকালে।
- আবেগ, যেমন— উত্তেজনা , ভয় ও রাগ।
- ইরিটেন্ট, প্রধানত বায়ু দূষণ।
- ধূমপান (হাঁপানি রোগীর নিজে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যর ধুমপান পরিহার করতে হবে)।
- আবহাওয়া পরিবর্তন।
- খাবার, যেমন— কৃত্রিম রং এবং কিছু কিছু খাবার।
- ওষুধ, যেমন— অ্যাসপিরিন।

**হাঁপানির উপসর্গসমূহ :**

- বাঁশির মতো করে শব্দ সহ শ্বাস-প্রশ্বাস।
- শ্বাসপ্রশ্বাস বাধাগ্রস্ত হওয়া।
- বুকে ব্যথা।
- কাশি ইত্যাদি।

**চিকিৎসা :** হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

# দাড়িভিটের বলিদান বাঙ্গালির ভাষা আন্দোলনের ক্রমিক প্রবাহ

**প্রবীর ভট্টাচার্য**

"মৃত্যু এবং খুনের তফাত নেই তো পরিণামে
হাওয়ায় বুলেট ঘুরছে আজকে বাংলাভাষার নামে
দাঁড়িয়েছিল কোনখানে ঠিক, ডাইনে নাকি বামে
পাঁজর ঘেষে লাগল বুলেট স্বাধীনতার নামে"

দ্রা-ম্! দ্রা-ম্! দ্রা-ম্! এক লহমায় শরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল পুলিশের বুলেট! দাড়িভিট উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে নিজেদের মিষ্টির দোকানের সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন তাপস বর্মণ। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সকাল থেকেই গণ্ডগোল চলছিল। কৌতূহলী নজর রাখছিলেন তাপস। প্রশাসন কী তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের দাবির তোয়াক্কা না করেই জোর করে উর্দু মাধ্যম চালু করবে? মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সব কিছু। সহসা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। দেখতে পেলেন অপস্রিয়মান পুলিশের গাড়িটিকে। জানলা দিয়ে তখনও বেরিয়ে আছে ঘাতক হাতটি! ছুটে এলেন মা। হাহাকার করে ডাকতে শুরু করলেন তাপসের বাবাকে, বোন ডলিকে। কিন্তু, ততক্ষণে বীরাত্মা তাপস তাদের ছেড়ে অমরত্বের পথে। তাঁরা এসে পৌঁছনোর আগেই মায়ের বুকে মাথা রেখে, মায়ের আঁচল রুধিরে সিক্ত করে ঝিমিয়ে পড়েন তাপস। বোন ডলি যখন এলেন, তখন রক্ত চুঁয়ে পড়ছে ডান হাতের কবজিতে বাঁধা রাখির ওপর। ঠিক একমাস আগে রাখি পূর্ণিমার দিনে দাদার হাতে রাখিটি বেঁধে দিয়েছিলেন তিনি। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেন না কিশোরী ডলি। দাদাকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদতে থাকেন তিনি।

ওদিকে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের মধ্যেও একই কাণ্ড। আগ্নেয়াস্ত্রের ট্রিগার টেপার শব্দ খান্ খান্ করে দিল চলমান হইচইয়ের উচ্চ কলরব। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গণ্ডগোল হচ্ছে সংবাদ পেয়ে তড়িঘড়ি আইটিআই কলেজ থেকে বাড়ি ফেরেন রাজেশ সরকার। ছোট বোন মউ দাড়িভিট উচ্চবিদ্যালয়েরই ছাত্রী, পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার দাবিতে আন্দোলনে শামিল। পুলিশ নাকি সমস্ত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ঘিরে ফেলেছে। কিছু হয়নি তো বোনের। ভাত বেড়ে বসেছিলেন মা। বারণ করেছিলেন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে না যেতে। মউ ঠিক চলে আসবে। মায়ের বারণ না শুনেই, বিদ্যালয়ের উদ্দেশে দৌড় দেন রাজেশ। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে চেঁচামেচি, হইচই। এরই মধ্যে গুলির আওয়াজ। বোনকে খুঁজতে থাকেন রাজেশ। হঠাৎ গুলির আঘাতে পালটে যায় সব কিছু। বন্ধুর উপরেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। মাঠে চাষ করছিলেন বাবা। ছুটে আসেন তিনি। রাজেশ তখন মাটিতে শুয়ে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা শরীর। গলার গামছা দিয়ে ক্ষতস্থান বেঁধে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার খানিক চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু তাতে কী আর হয়? ক্ষত যে গভীর! এদিকে ক্রমশ বুজে আসছে রাজেশের চোখ!

উপস্থিত সকলে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন তাদের হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার। গুলিবিদ্ধ রাজেশ ও তাপসকে নিয়ে একদল ছাত্র রওনা হয় হাসপাতালের দিকে। কিন্তু পথেই তাদের পথ অবরোধ করে একদল দুষ্কৃতী। রাজেশ-তাপসকে যারা হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল শুধু তাদেরই নয়, মৃতপ্রায় রাজেশ-তাপসকেও তারা বেধড়ক মারধোর করে। বহু কষ্ট করে স্থানীয় ইসলামপুর হাসপাতালে নিয়ে আসতে আসতে দিন কাবার হয়ে যায়। সেদিনই রাতে হাসপাতালে মৃত্যু হয় রাজেশের, পরদিন ভোরে মৃত্যু হয় তাপসের। এভাবেই মৃত্যুকে জয় করে মৃত্যুঞ্জয়ী হন বীরাত্মা রাজেশ-তাপস। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হন আরও এক কিশোর— বিপ্লব। ডান হাতে মারাত্মকভাবে সে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। চেন্নাইয়ের একটি হাসপাতালে এখনও তাঁর নিয়মিত চিকিৎসা চলছে। বাহুতে গুলির ক্ষতচিহ্ন নিয়ে বিপ্লব আজও শিক্ষায় বাংলাভাষার দাবিতে এক অক্লান্ত সৈনিক।

'ওঠ বাঙ্গালি, জাগ বাঙ্গালি ভাঙ্ বাঙ্গলি জিহাদ ঘাঁটি
জয় কালী জয় দুর্গা বলে গায়ে মেখে নে দেশের মাটি'।

২০১৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের এই লজ্জাজনক ঘটনার খবর প্রশাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে শুধুমাত্র সোশ্যাল মিডিয়া নয়, বরং দেশের সবকটি প্রচারমাধ্যমে জায়গা পেয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি হলো কতটুকু?

ফিরে যাই কিছুটা পিছনে। উত্তরদিনাজপুর জেলার দাড়িভিট নামের ছোট্ট এই গ্রামটি বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা। গ্রামের বুক চিরে তিরতির করে বয়ে চলেছে দোলঞ্চা নদী। গ্রামের অধিকাংশ মানুষই পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তু। এলাকার বাংলাভাষী মানুষদের সঙ্গে একসঙ্গেই বাস করেন স্থানীয় সূয্যপুরি ভাষার মানুষেরা। বাংলার পাশাপাশি স্থানীয় এই লোকভাষা ব্যবহার করেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশের একেবারে গা ঘেঁসে থাকায় বৃহত্তর ইসলামিক স্টেটের ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব থেকে এ এলাকাকে বাদ দেওয়ার কোনো কারণ নেই। এমতবস্থায় দাড়িভিট উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করেই ধুন্ধুমার। প্রায় দু' হাজার ছাত্র-ছাত্রীর দাড়িভিট উচ্চ বিদ্যালয়ের স্থায়ী শিক্ষক সংখ্যা মাত্র চোদ্দ, পার্শ্ব শিক্ষক পাঁচজন। শিক্ষক প্রতি ছাত্র-ছাত্রী একশো। শিক্ষার অধিকারে যদিও পরিষ্কার বলা আছে এই অনুপাত হবে ৩০/৪০ ছাত্র পিছু একজন শিক্ষক। বিদ্যালয়ে বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল সব বিষয়ে শিক্ষকের অভাব। অথচ প্রধান শিক্ষক একজন উর্দু শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য ব্যগ্র। টেলিভিশনের ক্যামেরায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবাদ জানিয়ে বলছে যে, তারা উর্দু বিষয় পড়তে আগ্রহী নয়। কারণ উর্দু তাদের ভাষাই নয়! শিক্ষকের নির্বিকার উত্তর, 'এসব তোমরা বুঝবে না। আমরা যা করছি তোমাদের ভালোর জন্যই করছি'।

এবার প্রশ্ন ওঠাই কী স্বাভাবিক নয়, যে এই ভালো কার জন্য, কী উদ্দেশ্যে? কোন অলক্ষ্য শক্তির অঙ্গুলি হেলনে প্রধান শিক্ষক ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা এই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছেন? যে সমস্ত শিশুর অবোধ বোলে আমরা দূরে সরিয়ে রাখি, তারাই কিন্তু এই ষড়যন্ত্র পর্দাফাঁস করে দিল। ধমক ধামক দিয়েও যখন তাদের থামাতে পারেনি, তখনই পুলিশ—গুলি—ধরপাকড়। গ্রামের প্রতিটি কিশোর-যুবক দিনের পর দিন বাড়ির বাইরে থেকেছে। রাতে নিজের বাড়িতে না থেকে ধানখেত বা নদীর ধারে ঘুরে বেড়িয়েছে। পুলিশের উৎপাত ঠেকাতে বাড়ির মহিলারা অন্দরমহল ছেড়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। রাজেশ-তাপসের মৃত্যুর যথাযথ তদন্তের দাবি করা কি সন্তান হারানো মায়ের অন্যায় আবদার? তবুও জেলা প্রশাসনের ভুলভাল রিপোর্টে আদালত মায়েদের বিরুদ্ধেই সরব হয়েছে। মজার ব্যাপার, যে ভয়ানক ঘটনার সাক্ষী গ্রামের হাজার হাজার মানুষ, অতি উৎসাহী অসংখ্য মানুষের মোবাইল ক্যামেরা, তা সত্ত্বেও রাজ্য প্রশাসনের অদ্ভুত নীরবতা। রাজেশ-তাপসের ডেথ সার্টিফিকেটে গুলিবিদ্ধ হওয়ার কোনও ঘটনার উল্লেখই নেই। 'উলটে চোর কোতোয়াল ধরে'— এই প্রবাদই এখানে সত্য হচ্ছে। গ্রামবাসীদেরই সরকার দোষী সাব্যস্ত করেছে।

এটা বলার আর অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি আজ আবারও আক্রান্ত। খুব ধীরে এবং সুপরিকল্পিতভাবে ভাষাসন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। পাঠ্যপুস্তক থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে অসংখ্য প্রাকৃত শব্দ। সেখানে কৌশলে ঢোকানো হচ্ছে আরবি শব্দ এবং ইসলামি সংস্কৃতি। দাড়িভিটের ঘটনা এই বৃহৎ ষড়যন্ত্রেরই একটি অঙ্গ।

'বাংলা আমার মাতৃভাষা বাংলা আমার গান
বাংলামায়ের সবুজ আঁচল জুড়ায়ে আমার প্রাণ'।

বাংলাভাষার শিক্ষার দাবিতে বাঙ্গালির এই আত্মবলিদান, এতো নতুন কিছু নয়! দেশভাগের পর থেকেই বাঙ্গালিকে দফায় দফায় আন্দোলন করতে হয়েছে, বাংলাভাষায় শিক্ষালাভের জন্য। দিতে হয়েছে রক্ত, দিতে হয়েছে প্রাণ। পাকিস্তানের গণপরিষদে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার ঘোষণা করার প্রস্তাবনা করা হয়, এর প্রত্যুত্তরে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ পাকিস্তানের গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে জনগণের ভাষা বাংলাকে ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতির দাবি তোলেন পূর্ববঙ্গ থেকে গণপরিষদে নির্বাচিত সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গ থেকে নির্বাচিত অপর তিন বাঙ্গালি হিন্দু সদস্য প্রেমহরি বর্মণ, ভুপেন্দ্রকুমার বর্মণ ও শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এর তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান, পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন, ডেপুটি স্পিকার এবং গণপরিষদে পূর্ববঙ্গের বিশিষ্ট সদস্য মৌলবি তমিজুদ্দিন খান। কারণ এরা কেউই বাংলা পড়তে জানতেন না। গণপরিষদে সেদিন এই প্রস্তাব খারিজ হলেও কিন্তু পরবর্তীকালে এই দাবিতে গণআন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনে বাঙ্গালি হিন্দুর সম্পৃক্ততা ছিল সর্বত্র। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মী পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২-তে একটি প্রতিবাদ কর্মসূচি নেয়। সেদিন পুলিশের গুলিতে অনেকের মৃত্যু হয়, পুলিশ ও মিলিটারি রাতে মর্গ থেকে বহু মৃতদেহ গুম করে। দেশভাগের পর স্বাধীন ভারতেও বাঙ্গালিকে তার ভাষিক অধিকারের জন্য আন্দোলন করতে হয়েছে, রক্ত দিতে হয়েছে, প্রাণ দিতে হয়েছে। এই পটভূমি বুঝতে গেলে পিছিয়ে যেতে হবে অতীতে।

বিংশ শতাব্দীর ঊষালগ্নে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বাঙ্গালি বিপ্লবীরা। সুচতুর ব্রিটিশ শত্রুকে চিনতে ভুল করেনি। 'মার্শাল রেস থিয়োরি' নামে এক অসার তত্ত্ব খাড়া করে সেনাবাহিনীতে বাঙ্গালির প্রবেশ বন্ধ করেছিল। বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনাও এই একই কারণে। বাঙ্গালি হিন্দুর কোমর ভেঙ্গে দিতে বঙ্গপ্রদেশকে তারা এমনভাবে ভাগ করল যাতে উভয় ভাগেই বাঙ্গালি

হিন্দু সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়। বঙ্গপ্রদেশের একাধিক বাঙ্গালি হিন্দু অধ্যুষিত সীমান্ত জেলাকে পার্শ্ববর্তী প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এইভাবে সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলাকে অসমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। মানভূম, সাঁওতাল পরগনা, সেরাইকেল্লা-থরসাওয়া, সিংভূম ও ময়ূরভঞ্জ জেলাকে বিহার-ওড়িশার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

১৯১২ সালে মানভূম বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, যদিও ১৯৩১-এর জনগণনায় দেখা যায় যে, জেলার সদর মহকুমায় ৮৭ শতাংশ বাংলাভাষী। বাংলাকে সরকারি ভাষা ঘোষণার দাবিতে ১৯৪৮ সালের ১৪ জুন কংগ্রেসের বাঙ্গালি নেতৃবৃন্দ অতুল্যচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে লোকসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে সত্যাগ্রহ শুরু করে। ৫২-এর নির্বাচনের পর সঙ্ঘের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা মানভূম জেলায় বাংলাভাষীদের ভাষিক অধিকারের কথাই বিধানসভা ও লোকসভায় তুলে ধরেন। ১৯৫৪ সালে বিহার সরকার টুসু গানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। অতুল্য ঘোষ, লাবণ্যপ্রভা সরকার, ভজহরি মাহাতো প্রমুখ নেতাকে কারাগারেও প্রেরণ করে সরকার। অসমের কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলায় বাঙ্গালির ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়। অসম সরকার নানা কৌশলে জেলায় বাংলামাধ্যমে পঠন-পাঠনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে থাকে। ১৯৬০-এর এপ্রিলে অসম সরকার অসমীয়কেই একমাত্র সরকারি ভাষা ঘোষণা করার প্রস্তাবনা করে এবং ১০ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী বিমলপ্রসাদ চালিহা বিধানসভায় অসমীয়কে একমাত্র সরকারি ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে বিল পেশ করেন। এর ফলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় শুরু হয় বাঙ্গালি খেদাও অভিযান। রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ মানুষের ভাষাকে বাকিদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়ায় গণসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। বরাক উপত্যকায় বাংলাকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলেন পরিষদ নেতৃবৃন্দ। ১৯ মে পূর্ণ হরতালের ডাক দেন তাঁরা। শিলচরে শান্তিপূর্ণভাবে রেল অবরোধ করেন। অসম রাইফেলসের জওয়ানরা একদল সত্যাগ্রহীকে ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়ার সময় বাকিরা প্রতিবাদে দৌড়ে এলে গুলি চালায়। গুলিতে এগারো জন বাংলা ভাষায় শিক্ষার দাবিতে বলিদান দেন। এর মধ্যে ছিল দুই কিশোর-কিশোরী শচীন্দ্রচন্দ্র পাল ও কমলা ভট্টাচার্য। এই ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের পর অবশ্য অসম সরকার বরাক উপত্যকায় জেলাস্তর পর্যন্ত সরকারি ও প্রশাসনিক কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের স্বীকৃতি দেয়।

নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকারের দাবিতে বাঙ্গালি সবসময় সরব। কেউ কখনও তাকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। মানভূম, শিলচরের মতো দাড়িভিটের এই বলিদান, বাঙ্গালির ভাষা আন্দোলনের এক ধারাবাহিক প্রবাহ।

ভাষা মানে শুধু মুখ থেকে উৎসারিত কিছু আঞ্চলিক শব্দগুচ্ছ নয়, ভাষা মানে সেই অঞ্চলের সংস্কৃতির প্রকাশও। বাংলাভাষায় কথা বললেই শুধুমাত্র কাউকে বাঙ্গালি বলা যায় না, বরং হাজার হাজার বছরের প্রাচীন এই ভুখণ্ডের যে সংস্কৃতি যা ভারতীয় মূল সংস্কৃতিরই অঙ্গ, তাকে নির্ভর করে যে সমৃদ্ধ ভাষাগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে, তাকেই বাঙ্গালি বলা চলে। দাড়িভিটের বাঙ্গালি ছাত্র-ছাত্রীরা মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকারের দাবিতে যে গণআন্দোলন গড়ে তুলেছে, ১৯-এর পথ ধরে ২০ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে সেটিই মাতৃভাষা দিবস। দারিভিটের মানুষ আজও রাজেশ-তাপসের মৃতদেহ আগলে রেখেছেন মাটির নীচে দোলঞ্চা নদীর শীতল স্পর্শে। রাজেশ তাপসের এই আত্মবলিদান আমরা বৃথা হতে দেব না।

**নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকারের দাবিতে বাঙ্গালি সবসময় সরব। কেউ কখনও তাকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। মানভূম, শিলচরের মতো দাড়িভিটের এই বলিদান, বাঙ্গালির ভাষা আন্দোলনের এক ধারাবাহিক প্রবাহ।**

ড. মোহিত রায়

২০১৮-র ২০ সেপ্টেম্বর উত্তর দিনাজপুর জেলার দাড়িভিট হাইস্কুলের গুলি চালনার ঘটনা এখন সবাই জানেন। আলোচনার সুবিধার জন্য অল্পকথায় প্রেক্ষাপটটা আরেকবার দেখে নেওয়া যাক। দাড়িভিট হাইস্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি ছিল বাংলা ও বিজ্ঞান শিক্ষকের। এই স্কুলে উর্দুভাষী ছাত্র-ছাত্রী নেই। স্থানীয় মুসলমান তৃণমূল নেতার তৎপরতায় সরকারের বিদ্যালয় দপ্তর পাঠালো বাংলা ও বিজ্ঞান শিক্ষকের জায়গায় উর্দু শিক্ষক এবং সংস্কৃত শিক্ষক। অবাঞ্ছিত উর্দু শিক্ষকের নিয়োগকে একটু সহনশীল করার জন্য সম্ভবত সংস্কৃত শিক্ষককের নামটাও যুক্ত করা হয়েছিল। ছাত্ররা মানেনি, প্রতিবাদ করেছিল। প্রতিবাদ করেছিলেন গ্রামবাসীরা। অতএব পুলিশ সামান্য উত্তেজনাতেই গুলি চালায়, ফলে দুই প্রাক্তন ছাত্র রাজেশ সরকার এবং তাপস বর্মণের মৃত্যু হয়।

# দাড়িভিটের স্ফুলিঙ্গ থেকে ভাষা আন্দোলনের প্রদীপ জ্বালাতে আমরা ব্যর্থ

এর প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ সপ্তাহখানেক উত্তাল হয়। জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠন এবিভিপি মিছিল মিটিং করে। বিজেপি ২৬ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বনধ্ ডাকে যা আংশিক সফল হয়। এই বনধ্‌কে সফল করতে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির যুবমোর্চার সভাপতি দেবজিৎ সরকার দাড়িভিট গেলে তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাঁর উপর পুলিশ অত্যাচার চালায়, যার ফলে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে জামিনে মুক্তি পান। পাশাপাশি মৃতদের পরিবার সিবিআই তদন্তের দাবি জানায় এবং মৃতদেহদুটির সৎকার করতে দেয় না। শবদেহ দুটি মাটি চাপা দিয়ে গ্রামেই রেখে দেওয়া রয়েছে। এরপর থেকে আর ঘটনা বিশেষ কিছু গড়ায়নি। তৃণমূল সরকার সিবিআই তদন্তের দাবি মানেনি।

**স্থান কাল পাত্র :**

**স্থান :** দাড়িভিট উচ্চ বিদ্যালয়টি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমার অন্তর্গত। পূর্বতন পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উত্তর অংশ নিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলা গঠিত হয় ১৯৯২ সালে। এর সম্পূর্ণ পূর্ব সীমান্ত জুড়ে রয়েছে বাংলাদেশ। ১৯৮১ সালে এই জেলার (১৯৯২ পরবর্তী জেলাটির অঞ্চলের) হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৬৩.২৬ শতাংশ, মুসলমান ৩৫.৭৯ শতাংশ। জ্যোতি বসুর কমিউনিস্ট রাজ একদশকের মধ্যে এই জেলায় মুসলমান অনুপ্রবেশের ঢল নামিয়ে মুসলমান জনসংখ্যা অভাবনীয় বাড়িয়ে দেয় ৯.৫ শতাংশ। ১৯৯১ সালে হিন্দু জনসংখ্যা কমে হয় ৫৪.২ শতাংশ, মুসলমান বেড়ে ৪৫.৩৫। তৃণমূলের দয়ায় ২০১১ সালে সবুজ নিশান উড়িয়ে উত্তর দিনাজপুর মুসলমান প্রধান জেলা হয়ে যায়। ২০১৮-তে যে অবস্থা আরও ভয়ানক তা বলাই বাহুল্য। এহেন জেলার গ্রামগুলির অবস্থা আরও ভয়ানক। উত্তর দিনাজপুরের শহরগুলিতে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত ভালো হলেও গ্রামাঞ্চলে তা যথেষ্ট কম। দাড়িভিট স্কুলটি ইসলামপুর মহকুমায়। ইসলামপুর শহরে হিন্দু জনসংখ্যা ৬৭ শতাংশ (২০১১) হলেও ইসলামপুর মহকুমায় গ্রামাঞ্চলে হিন্দু জনসংখ্যা মাত্র ২৭ শতাংশ (২০১১)। দাড়িভিট স্কুলটি থেকে বাংলাদেশ সীমান্তের দূরত্ব সামান্য, ২ কিলোমিটার মাত্র। এই হলো স্থান।

**উত্তর দিনাজপুর জেলা**

| | ১৯৮১ | ১৯৯১ | ২০০১ | ২০১১ |
|---|---|---|---|---|
| হিন্দু % | ৬৩.২৬ | ৫৪.২০ | ৫১.৭২ | ৪৯.৩১ |
| মুসলমান % | ৩৫.৭৯ | ৪৫.৩৫ | ৪৭.৩৬ | ৪৯.৯২ |

(সূত্র : ভারত সরকারের জনগণনা রিপোর্ট)

**কাল :** মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি চরম ইসলামি মৌলবাদী বন্ধু সরকারের রাজত্বকাল।

**পাত্র :** এই স্থান ও কালের ভয়াবহতাকে অগ্রাহ্য করে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও গ্রামবাসীরা। এবং দ্বিধাচিত্তের আমরা।

**উর্দুর বিরুদ্ধে এবং হিন্দু বলেই কি গুলি?**

উর্দুর বিরুদ্ধে এবং হিন্দু বলেই কি গুলি চালাল তৃণমূলের পুলিশ? এরকম একটা কথা কি সাম্প্রদায়িকতা হয়ে যায় না? তবে দেখা যাক কখন কখন তৃণমূলের পুলিশ গুলি চালায়।

১ ডিসেম্বর ২০১১। সবে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছে। মগরা থানার মুসলমান অধ্যুষিত নৈনান গ্রামে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের আধিকারিকেরা যান বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করতে। গ্রামবাসীরা বিদ্যুৎকর্মীদের আটকে রাখে। পুলিশ তাদের উদ্ধার করতে গেলে পুলিশকে আক্রমণ করে গ্রামবাসী।

পুলিশ গুলি চালালে ২ জন মুসলমান মহিলা মারা যান। সব দোষ চাপল পুলিশের ঘাড়ে। ৩ জন পুলিশকর্মী সাসপেন্ড হলেন, মৃতেরা ক্ষতিপূরণ পেলেন। ব্যস, পুলিশ বুঝে গেল তৃণমূল জমানায় কোথায় গুলি চালাতে হবে না।

২০ অক্টোবর ২০১২— রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর সামনে বাস চাপা পড়ে মারা যান স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ আকিল। শুরু হলো তাণ্ডব। ৮৬টি বাস, ১১টি গাড়ি, ২টি ট্রাম ভাঙচুর করা হয়। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় ট্রাম ও বাস ডিপোটি। পুলিশ গুলি চালায়নি, কিছুই করেনি।

২৮ নভেম্বর ২০১৪। জামাতে উলেমা হিন্দের নেতা (পরে মন্ত্রী) সিদ্দিকুল্লার নেতৃত্বে ময়দানে জনসভার নামে চলে সন্ত্রাস। ৩ জন আইপিএস অফিসার সহ ১১ জন পুলিশ আহত হন, পুলিশের ১১টি গাড়ি ভাঙচুর হয়। পুলিশ গুলি চালায়নি।

১৭ জানুয়ারি ২০১৭— মুসলমান অধ্যুষিত ভাঙড় অঞ্চলে বিদ্যুৎ পরিবহণ কেন্দ্র (পাওয়ার গ্রিড) নির্মাণ নিয়ে বিরোধিতায় সেখানকার মানুষ পথ অবরোধ করে। তা সরাতে গেলে পুলিশের উপর প্রবল আক্রমণ হয়। ১০টি পুলিশের গাড়ি পুকুরে ফেলে দেওয়া হয় বা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। অনেক পুলিশ আহত হন, অনেকে তাঁদের উর্দি খুলে পালান। পুলিশ গুলি চালায়নি।

তাহলে দাড়িভিট স্কুলে কী এমন হয়েছিল যে পুলিশ গুলি চালালো? দাড়িভিট স্কুলের বিক্ষোভে ছিল ছাত্র-ছাত্রীরা। কিছু গ্রামবাসী। কারো কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না, কোনো বোমাও ফাটেনি। কিছু ঢিল ছোড়া হতেই পারে। কোনো পুলিশের আহত হবার তেমন খবর নেই। তবু পুলিশ গুলি চালালো কেন? কারণ একটাই, পুলিশ জানে যে তৃণমূল জমানায় পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের মারলে কাউকে কোনো কৈফিয়ত দিতে হবে না। পুলিশের লোকেরা তো সমাজেরই মানুষ। তাঁরা দেখছেন ইমাম ভাতা থেকে ফিরহাদ হাকিমের কলকাতার মেয়র হবার ঘটনা। দেখছেন কালিয়াচক, খাগড়াগড়, ধুলাগড়। সুতরাং তারা কোথায় গুলি চালাতে হবে বা হবে না তা ভালোই বোঝেন।

**আমরা কি কিছু বুঝলাম, কিছু করলাম?**

অন্যদের দোষারোপ করে লাভ নেই, নিজেদের প্রশ্ন করি আমরা এক বছরে কী বুঝলাম, কী করলাম? প্রথমত, বেশ কয়েকটা মিছিলে হেঁটেছি, এবিভিপির মিছিলেও। কিন্তু কেউ তাদের পোস্টার ব্যানারে 'হিন্দু' কথাটাই লেখেননি। স্রেফ 'ছাত্র হত্যা'। এটা কী শুধুই ছাত্র হত্যা? কেন জানি না এখনো এ ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট দ্বিধায় রয়েছি মনে হয়।

দ্বিতীয়ত, এই ঘটনা কি পশ্চিমবঙ্গের ভাষা আন্দোলনের সূচনা করতে পারে? মনে রাখতে হবে যে, পাকিস্তান আমলে ১৯৫২ সালে ঢাকায় ঘটা বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ৪ জন মুসলমান যুবকের নিহত হবার ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে অতি পরিচিত। ১৯৭২-এ বাংলাদেশ গঠিত হবার পর এই ঘটনার প্রচার হয়েছে আকাশচুম্বী। একটু শিক্ষিত হিন্দু বাঙ্গালিই সালাম, বরকত, আবুল, জব্বারের নাম জানে। কিন্তু ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবর্ষে অসমের শিলচরে বাংলাভাষার জন্য ১১ জন আত্মবলিদানকারীদের কথা খুব কম বাঙ্গালি হিন্দুই জানেন। এমনকী পশ্চিমবঙ্গের নামিদামি সাহিত্য পত্রিকা, বুদ্ধিজীবী সবাই এ ব্যাপারে নীরব। এই আত্মবলিদানকারীদের একজন নারী— কমলা ভট্টাচার্য। আরও একটা বড়ো কথা, এই ১১ জন আত্মবলিদানকারীদের মধ্যে ৯ জনই হচ্ছেন পূর্বপাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু। হিন্দু বাঙ্গালিকে কেন বাংলা নিয়ে গর্বের স্থান পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশ থেকে উচ্ছেদ হতে হয় এ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ চুপ। এই আত্মবলিদানকারীদের নামে কলকাতায় বা অন্য শহরে কোনো রাস্তা নেই, কোনো স্মারক স্তম্ভ নেই। অথচ ঢাকার ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা-শহিদ স্মারকের অনেক নকল এখন কলকাতা ও অন্যান্য শহরে দেখতে পাওয়া যাবে। পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানাতে এটা তৃণমূল জমানার অবদান।

এই অবস্থায় বাংলাভাষা নিয়ে সংগ্রাম আন্দোলনের কথা এলেই ২১ ফেব্রুয়ারি চলে আসে যার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কোনো যোগ নেই। আর এই ২১ ফেব্রুয়ারির হাত ধরে আমরা সবাই বাঙ্গালি, দুই বাংলা, একই মানুষ— ইত্যাদি ভাবের কথা সংবাদপত্র, টেলিভিশন, বুদ্ধিজীবী সবাই বলে চলেন। কিন্তু বাঙ্গালি যে শুধু বাংলাভাষা দিয়ে হয় না, তার পাঁচ হাজার বছরের সংস্কৃতির ঐতিহ্য স্বীকার করেই বাংলাভাষী বাঙ্গালি হতে পারেন— সেকথা শোনে কে? তাই একদল বাংলাভাষী শিশু মাদ্রাসায় আরবি শেখে, একদল বাংলাভাষী মানুষ শেখে দেড়হাজার বছর আগের পৃথিবী অন্ধকারের পৃথিবী, একদল বাংলাভাষী মানুষ বিশ্বাস করে একমাত্র তার ধর্ম ও ঈশ্বর বাদে বাকি সব বিশ্বাস ঘৃণ্য। বাংলাভাষী বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম তাই ইসলাম। বাংলাদেশে সেজন্য কোনো মহাপুরুষের মূর্তি স্থাপন নিষেধ। আজকের বামপন্থী সেকুলার বুদ্ধিজীবী কণ্টকিত এবং তৃণমূল কংগ্রেসের ইসলামি মৌলবাদী তোষণের পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ হয়ে উঠছে পশ্চিম বাংলাদেশ— জনসংখ্যা, সংস্কৃতি ও বাংলাভাষার বিকৃতিতে।

দাড়িভিটের রাজেশ তাপস, গ্রামবাসীরা এরকম প্রতিকূল অবস্থায় একটি ভাষা আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়েছিলেন প্রাণের বিনিময়ে। পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছিল তার নিজস্ব ভাষা আন্দোলনের নান্দীমুখ। ইসলামি মৌলবাদী দাপটের বিরুদ্ধে উত্তর দিনাজপুরের অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সেখানে বাঙ্গালি হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরা, গ্রামবাসীরা উর্দুর আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষার শিক্ষকের জন্য, বিজ্ঞান পঠনপাঠনের জন্য প্রাণ দিলেন রাজেশ, তাপস। এ শুধু একটি ভাষার আক্রমণের বিষয় নয়, এর সঙ্গে যুক্ত পশ্চিমবঙ্গে ইসলামি মৌলবাদের আক্রমণাত্মক নীতি। কিন্তু আমরা ব্যর্থ তাঁদের এই মৃত্যুঞ্জয়ী অবদানকে সম্মান জানাতে। দাড়িভিট সুযোগ দিয়েছিল বাংলাভাষা ও বাঙ্গালির নতুন পরিচয়কে সবার সামনে তুলে ধরতে, আমরা পারলাম না। দাড়িভিট নিয়ে প্রয়োজন ছিল ধারাবাহিক রাজ্য জুড়ে প্রচার আন্দোলন, দাড়িভিটে ভাষা আন্দোলনের স্মারক নির্মাণ। দাড়িভিটের ঘটনা থেকে শুরু হতে পারতো রাজ্য জুড়ে মাদ্রাসা বন্ধের আন্দোলন, মাদ্রাসায় আরবি শিক্ষা বন্ধের আন্দোলন। দাড়িভিটের প্রতিবাদ জন্ম দিতে পারতো পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব ভাষা আন্দোলন। কেবল ক্ষমতায় আসার আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ হওয়া ঠেকাতে পারবে না।

আগামী দিনে হয়তো আমরা পারবো। ■

# বাঙ্গালি হিন্দুর ভাষা-দিবস শুরু হোক দাড়িভিট থেকে

**ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস**

এক সময় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার অবসরে চলে যেতাম আশপাশে। মানুষের জীবন যাপনে নিস্তরঙ্গ শান্ত রূপ— দূরে ঢেউ খেলানো হিমালয়ের নীল দিগন্ত। একদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো রায়গঞ্জের মোড় পেরিয়ে বেশ কিছু অঞ্চলে ১৪ আগস্ট নাকি পাকিস্তানের পতাকা তোলা হয়েছে! অঞ্চলটি ইসলামপুর মহকুমার অন্তর্গত। যখনকার কথা বলছি তখন ইসলামপুর মহকুমা হয়নি। জেলা ভাগ হয়নি— সবটাই পশ্চিম দিনাজপুর। এক ছাত্র তার বোনের বিয়েতে নেমন্তন্ন করল। মুসলমানদের বিয়ে দেখিনি, বিশেষত বাঙ্গালি মুসলমানের বিয়ে। কৌতূহল মেটাতে গেলাম। বললাম, রাত্রে থাকব না। সে এক আশ্চর্য অভিযান হলো। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার বাইরে এরকম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা বেশি নেই। অধিকাংশ মুসলমান। ছেলেটি গ্রাম ঘুরিয়ে দেখাল। একটু পরে কবরখানা। তারপর মাটি নেমে গেছে সামান্য জলা পেরিয়ে চযা জমি তাঁরকাঁটা— ওপারে বাংলাদেশ। ১৯৮৪-৮৫-র কথা। অধিকাংশ মানুষ কিন্তু বাংলাভাষায় কথা বলে না। আমার ওই ছাত্রটি বলছিল কবরখানায় স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না। খাসজমি দখল করার উদ্যোগ নিচ্ছে তারা। ইদানীং সেই ছাত্রটি 'সূর্যাপুরী' রাজ্য নিয়ে আন্দোলন করছে বলে শুনেছি। উত্তরবঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে এমন মোক্ষম চাল আর হয় না। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় চেয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ আর দক্ষিণ বঙ্গে দূরত্ব ঘোচাতে। বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সঙ্গে কথা বলে চেয়ে নেন বিহারের দুটি থানা— পশ্চিমবঙ্গ-বিহারের সেই দুই মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তে পশ্চিমবঙ্গ একটি অবিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক সীমানা পেয়েছিল। পশ্চিমে নেপাল, পূর্বে বাংলাদেশ এই অঞ্চল। রাজনীতি শাস্ত্রের ভাষায় 'চিকেন নেক'। অঞ্চলটিতে গোলযোগ ঘটিয়ে দেশটিকে সমগ্র উত্তর পূর্ব অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা বিদেশি শত্রুরা করবে— তাতো প্রত্যাশিত। কিন্তু দেশীয় 'পঞ্চমবাহিনী' কখনো নকশালবাড়ি—হাতিঘিসা— খড়িবাড়ি অঞ্চলকে অশান্ত করলে, কখনো লেউমি-পাকুড়ি থেকে 'উত্তরাখণ্ড' আন্দোলন ঘোষণা করলে, ক্ষীণ হলেও স্বতন্ত্র 'সূর্যাপুর রাজ্য' গড়ার দাবি উঠলে বোঝা যায় এসব আড়াল চেষ্টারই প্রকাশ্য উৎসাহ ফেটে পড়ত গত শতাব্দীর আটের দশকে— পাকিস্তানের পতাকা তুলে ভারতের খাস জমিতে কবরখানা প্রসারিত করার মধ্য দিয়ে।

কথাগুলো মনে পড়ল ২০১৮-র ২০ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার 'দাড়িভিট' গ্রামের স্কুলে রাজ্য সরকারের গুলি চালনায় দুই প্রাক্তন ছাত্র রাজেশ সরকার আর তাপস বর্মণের আত্মোৎসর্গের ঘটনায়। পুলিশ গুলি চালিয়েছিল— সেকথা সমস্ত গণমাধ্যম সুস্পষ্ট ভাবে দেখিয়েছে। সরকার নিশ্চুপ থেকেছে। সমস্ত গ্রামবাসী সমবেত ভাবে দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ রেখেছে— নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে— সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন। সরকারি খাস জমিতে কবরখানা- এতিমখানা-খারিজি মাদ্রাসা গড়তে তাদের উৎসাহের কমতি নেই।

কী ছিল সেদিন দাড়িভিট স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবকদের দাবি? তারা চেয়েছিলেন স্কুলে বহু জরুরি বিষয়ের শিক্ষক নেই। ভূগোল- কম্পিউটার আর বাংলা পড়াবার শিক্ষক নেই। বিশেষত বাংলার শিক্ষক চাই। পরিবর্তে তারা পেয়েছেন একজন উর্দু শিক্ষক! জানা গেল বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ উর্দু শিক্ষকের চাহিদা জানায়নি; জানানোর প্রশ্নই নেই— ওই স্কুলের কেউ কস্মিনকালে উর্দু পড়তে চায়নি। গ্রামটির

আশপাশে তো উর্দুভাষী ছাত্র-ছাত্রী নেই! তবে কেন এই আশ্চর্য সিদ্ধান্ত? মুখ্যমন্ত্রী বললেন, রাজ্যে উর্দু অন্যতম ভাষা। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেসব অঞ্চলে শতকরা দশভাগ বা তার বেশি উর্দুভাষী বাস করে— সেখানে 'উর্দু অ্যাকাডেমি' গড়ে তোলা হবে। বস্তুটি কী তা জানার জন্য কলকাতা আসানসোল অঞ্চলে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে একটু চোখ কান খোলা রাখলেই দেখতে পাবেন। মুখ্যমন্ত্রীর হিজাব নকাব পরিহিত মোনাজাতের ভঙ্গি আর বহু নেতার মাথায় কুরুশ-টুপি পরে হাসিমুখে আদাব করার ছবি দেখতে পাবেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসা দেশি-পলি-ক্ষত্রি, নমঃশূদ্র-মালো-কৈবর্ত- ভূইমালি-রাজবংশী অধ্যুষিত এই গ্রাম ও আশপাশের খানিকটা অংশ বি.এস.এফ.-এর সোনামতি ক্যাম্পের পশ্চিমের বসতিটুকুতে তো উর্দুভাষী কেউ নেই? অনুপ্রবেশের কথা জানে না কে? শহর কলকাতায় সমস্ত বেসরকারি হাসপাতালে ঘুরে আসুন, কাছাকাছি বিদেশি মুদ্রা পরিবর্তনের দোকান-গুমটি দেখে আসুন, খবরের কাগজে চোখ রাখুন দেখবেন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীতে রাজ্যের জনবিন্যাস সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তা সত্ত্বেও এই অঞ্চলে তো বাংলাভাষারই দাবি ওঠার কথা! হলো না কেন? একটু খতিয়ে দেখা দরকার।

কাটিহার-কিষানগঞ্জ থেকে আসা উর্দুভাষা ভাষীরা তো আসছেই। অন্যদিকও আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল আনসার-আলবদার-রাজাকারের দল।

**রাজ্য সরকার তার পুলিশ প্রশাসন নিয়ে মাতৃভাষার দাবিতে জড়ো হওয়া কচিকচি ছেলে-মেয়েদের উপর বেপরোয়া হয়ে বড়ো বড়ো গাড়ি চালিয়ে দেবে। পুলিশ যমদূতের মতো হাতে তুলে নেবে অস্ত্র। জোর করে উর্দু শিক্ষক নিয়োগ করবে— তা মেনে নিতে না পারলে মায়ের কোল খালি হয়ে যাবে।**

তারা অধিকাংশই উর্দুভাষী। ১৯৪৬-এ বিহারের দাঙ্গার পর অনেকে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ- খুলনার চটকলে, কারখানায় চাকরি করত তারা। এইসব জঙ্গি মনোভাবাপন্ন মানুষগুলি পাকিস্তানি সৈন্যদের হয়ে বাংলাদেশে স্বাধীনতা বিরোধী 'ঘাতক-দালাল' ছিল। বন্ধু সহযোদ্ধা শাহরিয়ার কবির দীর্ঘদিন ধরে এদের বাংলাদেশ সরকার যাতে শাস্তি দেয় সে দাবি করে আসছেন। মুজিবুর রহমান এদের নির্দিষ্ট করে বন্দি করার কাজ করেছিলেন। এরাই দীর্ঘযাত্রা (লং মার্চ) করে স্থলপথে করাচি পর্যন্ত যেতে চেয়েছিল। 'মুহাজির'দের এই আন্দোলনের ফল ভুগছি আমরা। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী সমস্ত জেলায় এরা এসে জমি জায়গা দখল করছে— জালটাকা পাচার করছে, গোপাচারে এরা অগ্রসর। তৈরি হয়েছে প্রশাসনিক-রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে নগদ বিনিময় কাটমানি আদান-প্রদানের সংস্কৃতি। দাড়িভিটের ঘটনাটি প্রতীকের মতো হলেও একে বলবো পশ্চিমবঙ্গের বঙ্গভাষা রক্ষার আন্দোলনের উজ্জ্বল নিদর্শন।

কলকাতা শহরের 'ভাষা উদ্যান'-এ সেজেগুজে ফুল ছিটিয়ে আসা যে বুদ্ধিজীবীরা একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করেন তাঁদের মনে পড়ে না দাড়িভিটের কথা। অথচ একুশে ফেব্রুয়ারি তো পাকিস্তান সরকারের জোর করে উর্দু চাপানোর বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল? অসমে পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনটিকে 'ভাষা আন্দোলন' বলে ধরে নিয়ে তাঁরা যে ২০ সেপ্টেম্বরের দাড়িভিটের বাঙ্গালি হিন্দুর 'ভাষা আন্দোলন'কে উপেক্ষা করতে চাইছেন নির্লজ্জ তোষণের জন্য। তাঁদের মনে পড়ে না ১৯ মে-র কথা? শিলচরে ১১ জন হুতাত্মার আত্মদানের কথা মনে করলেও যে মুসলমান তোষণের বিষয়টি আড়ালে চলে যায়?

বদরুদ্দিন উমর বাংলা ভাষার দাবিতে ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারির আন্দোলনের উপর তথ্যপূর্ণ বই লিখেছেন। সে বইতে ভাষা আন্দোলনের একটি সমাজ বাস্তবতার দিক উঠে এসেছে। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ মোরেলগঞ্জ গ্রামে চলছিল 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' (Food for work) কর্মসূচি। জেলা খুলনা। নিঃস্ব

হতদরিদ্র গ্রামীণ মুসলমানরা সেদিন ধর্মঘট করেছিল। আসলে তাদের মনে হয়েছিল পরের প্রজন্ম মাতৃভাষায় পড়াশুনো করলেও উর্দুভাষী পাকিস্তানের উচ্চবর্গের শাসনে তারা চাকরি পাবে না— সম্মানের জীবন যাপন করতে পারবে না। যেভাবে লিখলাম, সেইরকম স্পষ্টভাবে নিশ্চয় তারা ভাবেনি— কিন্তু জনপ্রতিক্রিয়া যখন হয় তখন এভাবেই হয়।

এবার আসুন ২০-২১ মে ১৯৬১-র দক্ষিণ অসমের হাইলাকান্দি- নিলামবাজার-করিমগঞ্জ অঞ্চলে একটি ঘটনা পরম্পরার কথায়। বঙ্গভাষী মুসলমানরা সেদিন নিজেদের অসমীয় ভাষী বলে ঘোষণা করে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। অর্থাৎ পূর্বপাকিস্তানে বঙ্গভাষী মুসলমানরা যেভাবে বঙ্গ ভাষানুগত্য দেখিয়েছে— অসমে তারা সেই আনুগত্য দেখায়নি। এ থেকে স্পষ্ট হয় বঙ্গভাষী মুসলমান বলে কিছু হয় না। আশ্চর্যের কথা বরাক উপত্যকার বাঙ্গালিরা অনেকেই এনিয়ে কথা বলেন না।

বছর দুই আগে মুর্শিদাবাদে একটি আলোচনা সভা হয়, কলকাতার একটি সংখ্যালঘু বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদানে এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন কলকাতার খ্যাতিমান লেখক আবুল বাশার। বাংলাদেশের বহু গবেষক এসে 'প্রমাণ' করেছিলেন যে বাংলা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত নয় ফারসি ভাষার সম্পর্ক বেশি। বাংলা আসলে এদেশের মুসলমান নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি একটি ভাষা! উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন গৃহীত হয় পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায়। তখন বামপন্থী শাসন। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। আজ পর্যন্ত জানি না, সংখ্যালঘু বিশ্ববিদ্যালয় কী বস্তু! জানি না, যদি সংখ্যালঘুই হয় তবে কেন ওখানে মুসলমান ছাড়া অন্য কোনো বৌদ্ধ বা খ্রিস্টধর্মের মানুষের স্থান হয় না?

এই বিস্তৃত পটভূমিতে দাড়িভিটের '২০ সেপ্টেম্বরের ভাষা দিবস'-কে স্মরণ করতে হবে। গত বছর 'বাঙ্গালি হিন্দু'র ভাষা আন্দোলন হিসেবে দিনটি পালন করা হয়। কলকাতার রামমোহন হলে সেই অনুষ্ঠানে রাজেশ সরকার আর তাপস বর্মণের আত্মীয়রা এসেছিলেন। এবছর অনুষ্ঠানটি হবে দাড়িভিট গ্রামে। জাতির এই আত্মাহুতি বৃথা যাবে না। দেশ ভাগের পর বহু আশা, বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গে পা রেখে আমাদের বহু বঙ্গভাষী হিন্দু পূর্বজ আশা করেছিলেন, নিজেদের ধর্ম-সংস্কৃতি-ভাষা-ঐতিহ্য রক্ষা করা যাবে। তাঁরা সেদিন ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি নিজ বাসভূমে এরকম ভয়ংকর তোষণ শুরু হবে। রাজ্য সরকার তার পুলিশ প্রশাসন নিয়ে মাতৃভাষার দাবিতে জড়ো হওয়া কচিকচি ছেলে-মেয়েদের উপর বেপরোয়া হয়ে বড়ো বড়ো গাড়ি চালিয়ে দেবে। পুলিশ যমদূতের মতো হাতে তুলে নেবে অস্ত্র। জোর করে উর্দু শিক্ষক নিয়োগ করবে— তা মেনে নিতে না পারলে মায়ের কোল খালি হয়ে যাবে।

ইসলামপুর থেকে দাড়িভিট যাবার পথে পাবেন জীবনমোড়, চারখাম্বা, ভীমরুল্লা, চিমটি, সামসেরগঞ্জ— সমস্ত এলাকায় পাকিস্তানের পতাকা ওড়ানো (ইদানীং ঘাসফুল) জমাটবদ্ধ বিধর্মী অনুপ্রবেশকারী। দিনের চেয়ে রাত্রে এসব অঞ্চল বেশি চঞ্চল। ঘন ঘন বাজে মোবাইল। আসা যাওয়া করে অবৈধ চালানকারীদের মোটর সাইকেল আর নানান বাহন। দাড়িভিট যদি জাতীয়তাবাদী হয়, যদি সমর্থন না করে এই নৈরাজ্য? তাহলে? কী হবে? তার প্রমাণ পেয়েছে ২০১৭-র ২০ সেপ্টেম্বরের দুটি তাজা তরুণ। তারাও ছাত্র ছিল। পশ্চিমবঙ্গের সাদা ধুতি পঞ্জাবি বুদ্ধিজীবীরা চশমা মুছেও এদের দেখতে পান না! অথচ তাদের মনে পড়ে না— ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে যারা মারা গেছে তাদের বেশ কজনই তখনকার পশ্চিমবঙ্গের যুবক। তখনও মুসলমানের পক্ষে সীমান্ত ছিল উন্মুক্ত, আজও তাই। উদ্বাস্তুরাই রেললাইনের পাশে, নয়ানজুলির উপরে পশুর জীবনযাপন করতে বাধ্য? তাদের জন্য কোনো সমবেদনা নেই! এই ঘৃণ্য চতুর লোকগুলিকে বুদ্ধিজীবী বলে? জানি না।

দোলঞ্চার নাম আমরা শুনিনি অনেকেই। দোলঞ্চা ছোট্ট একটি অকিঞ্চিৎকর নদী। এর কূলের শ্মশানঘাটে শুয়ে আছে রাজেশ সরকার আর তাপস বর্মণের দেহ। তারা বাংলাভাষায় পড়তে চেয়েছিল। তাদের বুকে গুলি চালিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের 'জয়বাংলা' বলা ভণ্ড অত্যাচারী সরকার। কোনো ঘৃণাই এদের জন্য যথেষ্ট নয়। ছোট্ট এই নদীর ওপারে 'সোনামাতি ক্যাম্প'— সীমা সুরক্ষা বল (বি.এস.এফ.)- এর জওয়ানরা থাকেন। তার পরেই কাঁটাতারের বেড়া— ওপারে বাংলাদেশ। তারা জল বলে না বলে পানি, স্নানকে বলে গোসল, জল বলবে না বলে জলখাবারকে বলে নাস্তা, হাতমুখ ধোয়াকে বলে অজু করা, রামধনু বলবে না বলে রংধনু— পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ভাষাভঙ্গি যথাসম্ভব নকল করে বাংলাভাষাকে বলাৎকার করছে। এই উর্দু প্রভাবিত বাংলা বা উর্দু শিক্ষকের কাছে 'মোল্লা-বাংলা' পড়তে চায়নি ওরা— রাজেশ সরকার আর তাপস বর্মণ তাই শুয়ে আছে— দোলোঞ্চা নদী তাদের সমাধির মাটি ছুঁয়ে প্রবহমান। আমরা এই দুই আত্মোৎসর্গী মহৎ প্রাণকে ভুলবো না। জানি, কালের প্রবাহে এই দুঃশাসনের রাক্ষসীবেলা শেষ হবে। তখন নিশ্চয় বিচার হবে। তখন নিশ্চয় ২১ ফেব্রুয়ারি নয়, ২০ সেপ্টেম্বরই হবে বাঙ্গালি হিন্দুর প্রকৃত ভাষা দিবস। যে ভাষা গঙ্গার মতো পবিত্র। আজ থেকে হাজার বছর আগে এই ভাষার প্রশংসা করে বঙ্গাল কবি লিখেছিলেন :

ঘন রসময়ী গভীরা বক্রিসমুভগোপজীবিতা
কবিভিঃ।
অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ।।

অর্থাৎ গঙ্গা আর বঙ্গালবাণী উভয়েই ঘনরসময়ী, গভীর, সুন্দর, গতিবিভঙ্গের, উভয়েই কবিদের প্রিয়। আর দুটিতেই অবগাহন করলে পুণ্যলাভ হয়। জমজমের জলের মরুভূমির উটের কাঁটাগাছের সঙ্গে এই পবিত্রতার স্বাদ পাওয়া অসম্ভব!

# প্রকৃতিই গায় আগমনী

**নন্দলাল ভট্টাচার্য**

বিশ্বভুবন জুড়ে নিত্য রঙের খেলা। ইন্দ্রধনুর সাত রং নিয়ে আশ্চর্য সব কারিকুরি। মুহূর্তে বদলে যায় প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ সবই। মনে হবে কোন খেয়ালি আপন মনে টানছে এমন রং-তুলির টান। সময় বা পরিমিতি সম্পর্কে নেই বোধহয় তার কোনো জ্ঞান। বোধহয় কোনো পথভোলা উদাস পথিকের এই রং নিয়ে মাতামাতি। কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এই রঙের কারিগর সব কাজই করেন সময় মেপেই—আশ্চর্য এক নিপুণতায়। যেটুকু দরকার তার চেয়ে এক বিন্দু রঙেরও ব্যবহার নেই কোনো খানে। তাই বা কেন, সকলে যখন ব্যস্ত নানা কাজে— তখনও আপন কর্মে মগ্ন শিল্পী ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় দিচ্ছেন নানা রঙের প্রলেপ। আকাশে বাতাসে সাগর অরণ্যে তাঁর এই রঙের নানা ধূপছায়ার প্রকাশেই জানা যায় তিনি আসছেন। আপনা থেকেই বেজে ওঠে মায়ের আগমনী গীত।

গ্রীষ্মের তীব্রদাহে রুক্ষ্ম গৈরিক ধরিত্রীর বুকে কখন যে নেমে আসে নববর্ষার ধারা—কেমনভাবে শ্যামল হয়ে ওঠে মাতা বসুমতী তা সহজে ধরা পড়ে না প্রত্যহের চোখে। হঠাৎ-ই শ্যামাবরণী বসুধার রূপে দুচোখে আসে স্নিগ্ধতা। সৃজনের আনন্দে নন্দিতা তখন প্রকৃতি।

এই রং বদলের খেলায় বর্ষার কালো আকাশ হঠাৎই হয়ে ওঠে নীলে নীল। ঘন ঘন ভেসে বেড়ায় সাদা মেঘের ভেলা। বনপ্রান্তরে সাদা কাশের বনে ওঠে সমুদ্র লহর। তৃণমুখ হয় শিশিরভারে নত, শিউলি বিছানো পথের সুবাসে মন ভালো করা আবেশ। তখনই মন বলে মা আসছেন। তাঁর আসার কথা এভাবেই মনে করিয়ে দেয় প্রকৃতি। এও বোধ হয় যোগমায়ার সুমধুর এক মায়ার খেলা।

দৈনিকের নানা কাজে মন যখন বিক্ষিপ্ত, বুঝি বা পীড়িত—যখন ভুল হয়ে যায় সব তখনই প্রকৃতি জানিয়ে দেয় মাতৃ আগমনের কথা।
আকাল-বোধনে ঘুম ভেঙেছিল যে মায়ের একদিন, তিনি কিন্তু এখনও জেগে ওঠেন সেই একই ভাবে। তাঁর সেই জাগরণ, তাঁর আসার সেই শুভক্ষণের বার্তা তিনিই ছড়িয়ে দেন তাঁর সন্তানদের জন্য। করুণার এমন প্রকাশ মা ছাড়া আর কার মধ্যেই বা দেখা দিতে পারে!

ঋতুচক্রের নিত্য আবর্তনে মাতৃ আরাধনার এই শুভক্ষণের প্রকাশ ঘটে আপন নিয়মে—স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই। বিশ্বকর্মা পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অথবা তারও আগে ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবে মগ্ন হওয়ার পর থেকেই মন উন্মুখ হয়ে ওঠে মাতৃ আরধনার জন্য, মাতৃ দর্শনের জন্য। আর সেই আকাঙ্ক্ষারই চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে শরদপূর্ণিমার পক্ষকাল আগে মহালয়ার পিতৃতর্পণ শেষে দেবীপক্ষকে বরণ করার মধ্য দিয়ে। বস্তুত তখন থেকেই মাতৃবন্দনায় গুনগুনিয়ে ওঠে সকলে।

এমনটাই ঘটেছিল তখনও। ক্ষীরসমুদ্রে অনন্ত শয্যায় শায়িত জগৎপতি নারায়ণ। তাঁর নাভি থেকে উত্থিত পদ্মে ধ্যানমগ্ন ব্রহ্মা। এমনই সময়ে নারায়ণের কর্ণমূল থেকে জাত দুই অসুর মধু আর কৈটভ ব্রহ্মাকেই গ্রাস করতে উদ্যত হলো। আকুল ব্রহ্মা রক্ষা পাওয়ার জন্য শরণ নিলেন যোগমায়ার। প্রার্থনা তাঁর ঘুম ভাঙাল নারায়ণের। বাঁচান এই দুই অসুরের

হাত থেকে। তুষ্ট হলেন যোগমায়া। পরিত্যাগ করলেন নারায়ণকে। ঘুমভাঙা নারায়ণ বধ করলেন দুই অসুরকে।

এই যোগমায়ার মায়াতেই অষ্টমীর সেই রাতে কংসপুরে সকলে পড়ে ঘুমিয়ে। নির্বিঘ্নে গোকুলে নন্দপুরে কৃষ্ণকে রেখে আসেন বসুদেব। আর কন্যারূপে যশোদার পাশে শুয়ে থাকা দেবী যোগমায়াকে নিয়েই ফেরেন কংস কারাগারে। এই দেবী যোগমায়াই সেদিন কংসকে শোনান সেই চরম বার্তা—মৃত্যু তোমার আসন্ন—তোমাকে যে বধ করবে সে বাড়ছে গোকুলে।

এই দেবী যোগমায়ার কথাই শুনিয়েছিলেন মেধস মুনি রাজ্যহারা স্বজন পরিত্যক্ত রাজা সুরথ আর সমাধি বৈশ্যকে। বলেছিলেন তাঁর আরাধনা করতে। তাঁরই নির্দেশে চৈত্রের শুক্লপক্ষে তাঁরা করেছিলেন প্রথম মহিষাসুরমর্দিনীর আরাধনা। সার্থক হয় পূজা। পূর্ণ হয় তাঁদের কামনা। সব ফিরে পান তাঁরা। পান তাঁর চরণে স্থান।

সে ছিল মায়ের জাগরণের কাল। কিন্তু তিনি যখন নিদ্রিতা, শরতের সেই সময়েও দেবতাদের নির্দেশেই শ্রীরামচন্দ্র তাঁর নিদ্রাভঙ্গ করলেন। বোধনের মধ্য দিয়ে জাগ্রত করলেন তাঁকে। অকালে পূজা করে রাবণবধে হলেন সক্ষম। আর তার পর থেকে এই অকালবোধনই হয়ে উঠল চিত্তজাগরণের শুভ মুহূর্ত। শরতের অকাল বোধনই হলো মাতৃ আরাধনার এক কাঙ্ক্ষিত পুণ্যমুহূর্ত। এই মুহূর্তটির জন্যই শুধু বাঙ্গালি নয়, জগৎবাসীই অপেক্ষা করে থাকেন সারাটা বছর। এই পূজাকে কেন্দ্র করেই যেন আবর্তিত হয় জীবন। আর তাই প্রকৃতিই নানা রঙে সাজিয়ে তোলে এই বিশ্বসংসারকে। ঘুমিয়ে থাকা মানুষকেও ডেকে বলে ওঠে, জাগো, সময় হয়েছে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেওয়ার। প্রকৃতির সে আহ্বানে সাড়া দেয় সকলেই।

বস্তুত শরতের এই মাতৃ আরাধনা শুধুই দেবীর বন্দনা নয়, এই অরাধনা যে জীবনকে জাগানোর — জীবনকে সাজানোরও আরাধনা। সবার রঙে রং মেলানোর আকুল ডাকে সাড়া দিয়ে সবরকম ভেদাভেদের বেড়া ভেঙে তাই সকলে মিলিত হন এই শারদ উৎসবে।

শরতের অকালবোধন বাঙ্গালির জীবনে শুধুই একটি অনুষ্ঠান নয়। বাঙ্গালির জীবনে পুজো বলতে শুধু দুর্গা পুজোকেই বোঝায়। এর থেকেই বোঝা যায় বঙ্গজীবনে এই পুজোর গুরুত্বের কথা। সকলকে নিয়ে, সকলে হাত ধরাধরি করে শুভ উৎসবে মেতে ওঠার এমন নজির বোধ হয় আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বঙ্গজীবনে দেবী দুর্গার আরাধনা নিছক একটি পুজোঅনুষ্ঠান নয়, এ হলো মহান সর্বজনীন মহোৎসব। এই উৎসবের ডাক দেয় প্রকৃতি বহু আগে থেকেই।

রং-বদলের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি যে পূজা-উৎসবের আগমন বার্তা ঘোষণা করে, তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক সৃজন প্রক্রিয়াও। ঘুম থেকে ওঠে মানুষ যেমন ব্যস্ত হয় নানা ধরনের কাজে, পুজোর আগে থেকে তেমনই এক কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে যায় চারিদিকে। সারা বছরের প্রয়োজনীয় পোশাকপত্র থেকে সব কিছু কেনার কাজ এই পুজো। তাই তার বহু আগে থেকেই পশারিরা সাজিয়ে তোলেন তাঁদের পণ্যের ডালা। আর মানুষও ডালার পণ্য ঘরে তোলার জন্য সক্রিয় হয় প্রায় বছরের গোড়া থেকেই।

পণ্যের মতোই মাতৃমণ্ডপ তৈরির কাজও শুরু হয়ে যায় এখন আষাঢ়-শ্রাবণ থেকেই। মণ্ডপ সাজানোর কত না নতুন নতুন ভাবনা। সেই ভাবনা রূপায়ণেই শত কর্মীর নিপুণ হাত কাজ করে যায় দিনরাত্রি। একই তৎপরতা মূর্তি শিল্পীদের মধ্যেও। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই দশভুজার ভুবনভোলানো রূপটি ফুটিয়ে তোলার কাজে তাঁদেরও বিনিদ্র রজনী যাপন।

বাংলা সাহিত্যেরও নানা রূপকে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য একইভাবে কর্মযজ্ঞ চলে পত্রপত্রিকাগুলির দপ্তরে-দপ্তরে। নতুন ভাবনা—নতুন সৃষ্টিকে সকলের কাছে তুলে ধরার জন্য সে কী প্রাণপাত।

দুর্গাপুজো চারদিনের। কিন্তু তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় কয়েকমাস আগে থেকেই। কালো আকাশ যখন হয় নীল, বিজ্ঞাপনে যখন নানা রঙের বাহার—নানা প্রলোভনের হাতছানি, শারদীয়াগুলির আত্মপ্রকাশের ঘোষণা যখনই ফুটে ওঠে দৈনিকের পাতায়—তখনই বোঝা যায় পুজো আসছে—তখন থেকেই বাঙ্গালির মন ভিড় করে পুজো মণ্ডপে-মণ্ডপে। সেই ভিড়েরই আভাস এখন প্রকৃতির রঙে, দোকানে বাজারে।

**ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র**

**প্রণব**

**পড়ুন ও পড়ান**

# শব্দস্বরূপা মহামায়া

অমিত ঘোষ দস্তিদার

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সুক্তের দেবীসূক্ত নামক মন্ত্রসমষ্টিতে প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের জাগতিক উপলব্ধিজাত সত্যের উদ্‌ঘোষণা ব্যক্ত হয়েছে। এখানে ব্রহ্মরূপিণী বাগ্‌দেবীর সর্বাত্মক সর্বান্তর্যামী শক্তির পরিচয় ফুটে উঠেছে। 'শব্দাত্মিকা' স্বরূপে দেখা যায়, যখন সৃষ্টি নেই তখন পরমব্রহ্ম মহামায়া অশব্দ ও অস্পর্শ হয়ে একাকী অবস্থান করেন। যখন তাঁর সৃষ্টির ইচ্ছা হয় বা প্রয়োজন অনুভব করেন, তখন তিনি তাঁর মহামায়া শক্তির দ্বারা বহুরূপে বিবর্তিত হন। ব্রহ্ম মায়ার দ্বারা যত সহস্র পরিমাণে বিভক্ত হয়ে বিশ্বরূপ ধারণ করেন, বাক্য, পদ বা শব্দের সংখ্যাও তত। অনন্তভাবে বিবর্তিত হন বলে বাক্য, পদ, শব্দও অনন্ত।

অম্ভৃণাখ্য ঋষির কন্যা বাক্ ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সুক্তের দেবীসুক্তের দ্রষ্টী। অম্ভৃণ— শব্দটির অর্থ মহান বা অতি প্রবৃদ্ধ। বাক্ এখানে কাল্পনিক কোনো মানুষী চরিত্র নয়। অনাদি অনন্তকাল থেকে শব্দের যে বিচিত্র লীলাতরঙ্গ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্লাবিত করে চলেছে তারই মহিমাকীর্তনের মধ্য দিয়ে বাক্ মূর্ত হয়ে উঠেছেন। বাতাস, ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ এবং বিশ্বপ্রকৃতিজাত ও সমস্ত লোকজাত শব্দ— শব্দব্রহ্ম রূপে ঋষিদের উপলব্ধিতে এসে ব্রহ্মসমপর্যায়ে নিয়ে গেছে এবং ইন্দ্রাদিদেবগণের নিয়ন্ত্রী হয়ে উঠেছেন। অর্থাৎ বাগ্‌দেবী সমস্ত জগতের, সকল দেবগণের ও জীব সাধারণের একমাত্র আধারভূতা নিয়ন্ত্রী। বাগ্‌দেবী ব্রহ্মবিদূষী রূপে জগতের হয়ে নিজের স্তুতি নিজেই করেছেন। যেহেতু তিনি স্তুতিকা তাই তিনিও ঋষি। ঋষি রূপে সমস্ত কিছু অনুভব করতে করতে সর্ব জগৎরূপে এবং সকলের অধিষ্ঠানরূপে তিনি স্বস্তুতি করে চলেছেন।

সৃষ্টি সময়ে পরমপদ পরমাকাশে প্রতিষ্ঠিতা গৌরবর্ণা বাগ্‌দেবী জলতরঙ্গের মতো বর্ণ, পদ, বাক্য ইত্যাদি রচনা করতে করতে একটি শব্দ সৃষ্টি করেছিলেন। প্রথমে তিনি প্রণব রূপে একপদ বিশিষ্ট হয়ে ব্যোমময় পুরুষের হৃদয়ে আবির্ভূতা হলেন। তারপর ব্যাহৃতি (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ) ও সাবিত্রী (তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ইত্যাদি গায়ত্রী মন্ত্র)-রূপে দ্বিপদ বিশিষ্ট হলেন। তারপর চারটি বেদরূপে চতুষ্পদী হলেন। ছয় বেদাঙ্গ, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্ররূপে অষ্টাদশী হলেন। এরও পরে মীমাংসা, ন্যায়, সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, পাশুপত, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ রূপে নবপদী হয়ে আবির্ভূতা হলেন। একসময় ধীরে ধীরে অনন্ত বাক্ সন্দর্ভরূপে সেই সর্ববর্ণময়ী সর্বধ্বনিময়ী সহস্রাক্ষরা বাগ্‌দেবী এই অনন্ত জগৎ প্রকাশিত করলেন।

শব্দস্বরূপার এক থেকে বহুত্বের দিকে যাওয়া হলো শব্দের 'স্পন্দন' বা 'চলন'। শব্দ অব্যক্ত অবস্থায় নাদ, ব্যক্ত হলে প্রণব। প্রণব স্পন্দিত ও ঘনীভূত হয়ে হংস হয়। শাস্ত্র মতে— 'হং-কারো বিন্দুরিত্যুক্তো বিসর্গঃ স ইতি স্মৃতঃ। পুং প্রকৃত্যাত্মকো হংসস্তদাত্মকমিদং জগৎ'। হং হলো বিন্দু আর সঃ হলো বিসর্গ। আমরা 'বিন্দু-বিসর্গ' জানা না জানার কথা প্রায়ই বলে থাকি বা একে নানাভাবে আমাদের কথায় ব্যক্ত করি। আসলে 'বিন্দু' হলো উৎস আর 'বিসর্গ' হলো সৃষ্টি। শব্দকে নিত্য ও কার্য— এই দুইরূপে ভাবনা করা হয়। নিত্য শব্দ নির্গুণব্রহ্ম ও কার্যশব্দ সগুণব্রহ্ম। নিত্য শব্দ হলো ওঙ্কার বা প্রণব। আর হংস হলো কার্য। শব্দব্রহ্ম হলো সর্বভূতের চৈতন্য। প্রাণীদেহের মধ্যে কুণ্ডলীরূপ গ্রহণ করে গদ্য পদ্য ইত্যাদি ভেদে বর্ণরূপে আবির্ভূত হয়। শব্দাত্মিকা অর্থে তাই প্রণবরূপা। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে তা প্রকৃতি থেকে সৃষ্ট হয়েছে। তাই বলা হয়— প্রকৃতি স্পন্দনাত্মিকা। যে স্থানে স্পন্দন সেই স্থানে শব্দ। তাহলে সমস্ত বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে শব্দই আছে। অর্থাৎ নাদসাগরে এ ব্রহ্মাণ্ডতরণী ভাসছে। উপরে-নীচে, সামনে-পিছনে শুধু শব্দই আছে। যা কিছু সব শব্দেই লয় হয়। নিখিল প্রাণীহৃদয়ে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হয়ে চলেছে নিত্যনাদ। নাদ-এর জন্যই সকলে জীবিত অবস্থায় অবস্থান করছে। ফলত চক্ষের চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, মনের মন সকলই সে। সেই নাদ অব্যক্ত। ▌

# যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার**
**যৌগিক কলেজ**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

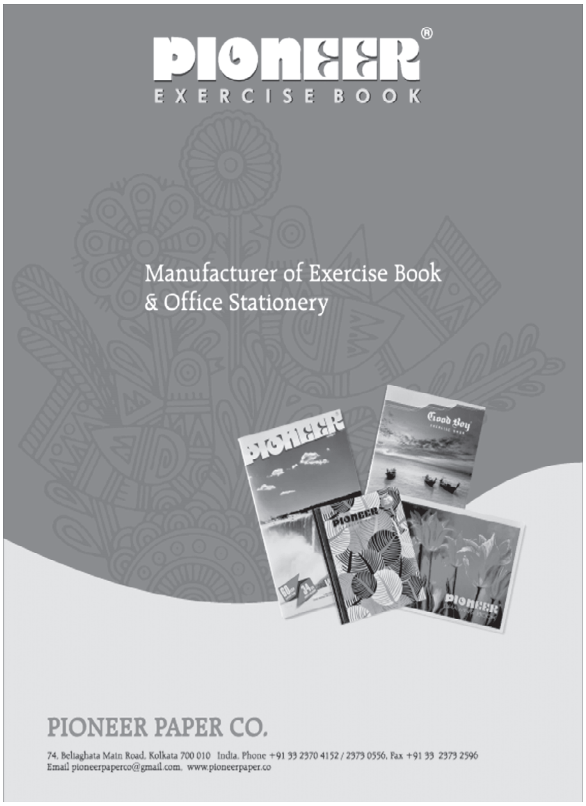


# বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

*নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।*
*মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।*

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

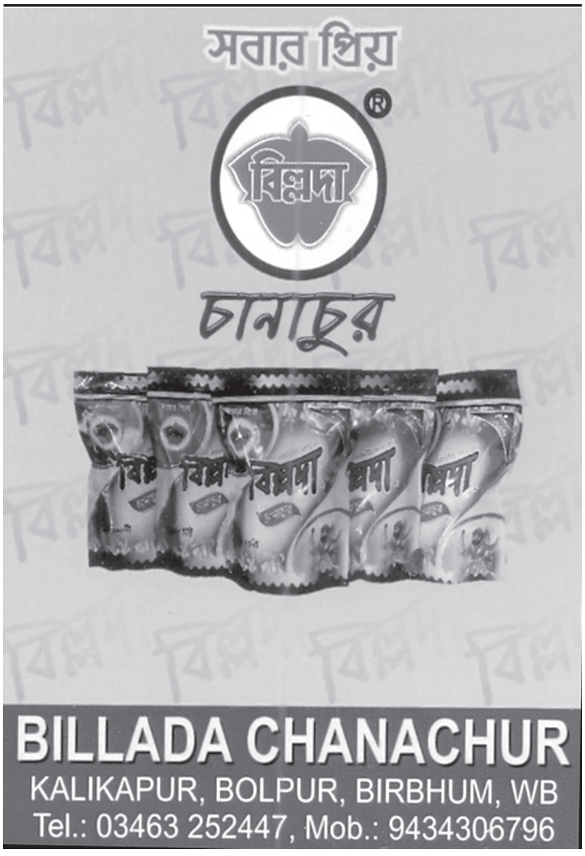

# ৯-কারের বিলোপসাধন প্রসঙ্গে কিছু আত্মগত কথা

**ড. প্রণব বর**

এমন একটি ব্যাকরণ রচনা করা সম্ভব, যাকে প্রকৃতার্থে বিশ্বের সাধারণ ব্যাকরণ বলা যাবে, কারণ বিশ্বের প্রতিটি ভাষাই কোনো না কোনো ভাবে একটি সূত্রে বাঁধা আর তা হলো মানুষের মনের ভাব প্রকাশের সামর্থ্য। বাস্তবিকও তাই, বাক্যে যাকে আমরা 'কর্তা' বলি সেই 'কর্তা' সব ভাষাতেই 'কর্তা' অর্থাৎ তিনিই সেই বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদনের নায়ক। কেবল সেই কর্তাকে নানা সংজ্ঞা বা টেকনিকাল টার্মে বা নাম ধরে ডাকা হয়। এই চিন্তা থেকেই এই বৈশ্বিক সাধারণ ব্যাকরণের কল্পনা। যার দ্বারা সব ভাষার ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে বলে বিশ্ববিশ্রুত ভাষাবিজ্ঞানী নোম চমস্কি মনে করেন। সেই চিন্তা থেকে তিন দশক ধরে তিনি কাজ করলেন। তার পর একবার আক্ষেপ করে বললেন যে 'স্প্যারোন্ত' (কৃত্রিমভাবে তৈরি করা আদর্শ ভাষা) আদি কুহকে পরিণত হয়েছে, গত তিন দশক ধরে আমরা পণ্ডশ্রম করলাম। অথচ এই কাজটি আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে কোনো এক ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিক করে রেখেছেন। তাঁর কাজের কণামাত্রও আমরা করে উঠতে পারিনি। তিনি পাণিনি, যাঁর শব্দানুশাসন বাস্তবিক অর্থে একটি 'কমন ওয়ার্ল্ড' কেবল তার থেকে সংস্কৃত ভাষার উদাহরণটিকে সরিয়ে নিয়ে যেকোনো ভাষা বসিয়ে দিলেই তার জন্য এই ব্যাকরণ যথাযোগ্য।

এই গৌরচন্দ্রিকার কারণ এই যে, সম্প্রতি নিজের সন্তানের পাঠ্যপুস্তক দেখে হতবাক হয়েছি। আমি তাকে যে বর্ণসমান্বয় কণ্ঠস্থ করিয়েছি, তা এই পুস্তকের সঙ্গে সাযুজ্যমান নয়। এই শিশুপাঠ্য পুস্তকটিতে ৯-কার একেবারেই অনুপস্থিত। তাহলে কি এই ৯-কার অপ্রয়োজনীয়? অথচ আমি নিজেই এইতো সেদিন শৈশবে '৯-কার যেন ডিগবাজি খায়....' ইত্যাদি দুলে দুলে কণ্ঠস্থ করেছি।

কেন হঠাৎ বর্ণসমান্বয় থেকে একটি বর্ণকে বাদ দেওয়া হলো, এটি যেন ছেলে খেলা। বলতে গেলে এটি একটি পুরাতন রোগ। হঠাৎ করে আমরা কোনো বর্ণকে

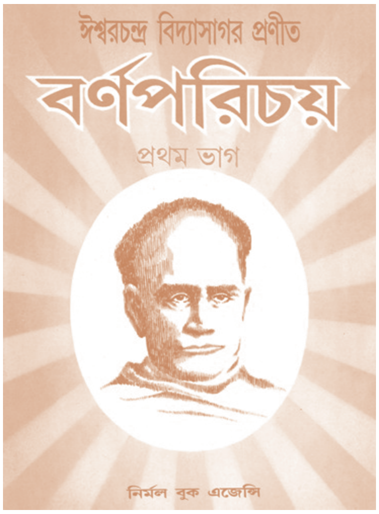


জুড়ে দিলাম, আবার হঠাৎ মনে হলো এটা অপ্রয়োজন একে বাদ দাও। জুড়ে দেওয়ার উদাহরণ থেকেই শুরু করি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনে হলো যে 'ৎ' (খণ্ডত) বলে একটি বর্ণের সংযোজন প্রয়োজন। প্রসঙ্গত সেটি ('ৎ') কখনই একটি সম্পূর্ণ অক্ষর নয়, স্বর বর্জিত ত, অথবা বলা যায় শুদ্ধ ত ব্যঞ্জন। এমনকী 'ক্ষ' বলে একটি সংযুক্ত অক্ষরকে সংযুক্ত করা হলো। যেটি ক্+ষ্+অ এর সম্মিলিত রূপ। এর সপক্ষে কেউ বলতেই পারেন যে বহুল ব্যবহারের জন্য প্রাথমিক বর্ণমালায় স্থান প্রাপ্ত হয়েছে। এখানে কোনো উৎসাহী ছাত্র প্রশ্ন করতেই পারে যে, তবে 'ঙ্ক' 'জ্ঞ', 'প্ত', 'ক্ত'-এর মতো সংযুক্ত অক্ষরগুলি কী দোষ করলো। তারা কেন বাদ পড়লো? চতুরতার সঙ্গে এটিকে একটি উদাহরণমাত্র বলে পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু 'ৎ' (খণ্ডত) প্রসঙ্গে কী যুক্তি? সেটিও কি উদাহরণমাত্র অথবা বর্ণমালায় একটি বিশেষ লেখনশৈলীর আগমনকে স্বীকৃতি দেওয়া হলো অথবা অন্য কিছু?

এবার আসা যাক অপসারণ প্রসঙ্গে। এটিও সদ্য ঘটে চলা বিকৃতির উদাহরণ মাত্র। যেখানে বলা হলো যে ৯-কার নাকি ব্যাকডেটেড। তার প্রয়োগ হয় না, তাই তা শেখানোর দরকার নেই, ওটি বোঝা মাত্র।

শেখানোর দরকার নেই অথবা আছে এটাই এক্ষণে আলোচ্য বিষয়। এখানে প্রাসঙ্গিক আরও কিছু প্রশ্ন এসেই যাবে যে, বর্ণমালায় স্বরবর্ণের সংখ্যা নিশ্চিত ভাবে কয়টি? বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা কয়টি? আমি এই দুটি প্রশ্নে আমার জ্ঞান অনুযায়ী আলোচনা করতে চাই। ভুল থাকলে শুধরেও নিতে চাই।

প্রাক্‌পাণিনিকালে মাহেশ ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল। সে সময় প্রক্রিয়া ক্রমেই পাঠদান করা হতো। তখন অ-কারাদি ক্রমেই বর্ণসমান্নায় বা বর্ণমালার পাঠদান করা হতো। সে সময়কার ঋকপ্রাতিশাখ্যে বর্ণমালায় ৫০টি বর্ণকে গ্রহণ করা হয়েছিল (১৩টি স্বর, ৩৩টি ব্যঞ্জন, তিনটি অযোগবাহ বর্ণ নিয়ে)। ঋক্‌তন্ত্রে বর্ণমালায় ৫৭টি কে গ্রহণ করা হয়েছিল। শুক্লযযুর্বেদপ্রাতিশাখ্যে ৬৫টি। তৈত্তরীয় প্রতিশাখ্যে ৬০টি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীধরটীকায় ৬৩টি। শঙ্করাচার্য প্রপন্নসারতন্ত্রে বর্ণমালায় ৫১টি কে গ্রহণ করেছিলেন (১৬টি স্বর, ২৫টি ব্যঞ্জন, ব্যাপক বলে অবশিষ্ট ১০টি)। **লৌকিক বর্ণমালার সংখ্যা মোটামুটি ভাবে বলা যায়---স্বর ১৩টি, ব্যঞ্জন ৩৩টি, অযোগবাহ ৬টি।**

বস্তুত কেবল 'অ' কারের মোট সংখ্যা আঠারোটি। যেগুলি হলো—হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত এই তিনটি প্রত্যেকটি উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ভেদে নয়টি, তারাই আবার প্রত্যেকে নাসিক্য, অননুনাসিক্য দুই ভেদে আঠারোটি। স্বরবর্ণের স্থানে কেবল দুটিকে (আ, আ) গ্রহণ করলে সেই লাঘবতায় দুষিত হয়ে যায় বৈকি, বাকি ষোলটির প্রতি অন্যায় হয়, যেখানে একটি 'আ'-কারের গ্রহণই যথেষ্ট,

যার দ্বারা ১৮-টি ‘অ’ কারকেই গ্রহণ করা হলো—এমন ই উ ঋ এদের প্রসঙ্গেও বলা যায়, কারণ এরাও ১৮ প্রকার। ৯-কার দ্বাদশ প্রকার (তাদের দীর্ঘ হয় না), এ ঐওঔ এরাও দ্বাদশ বিধ (তাদের হ্রস্ব হয় না)।

কিন্তু পাণিনি নিয়ে এলেন নতুন পথ সেখানে কোনো বর্ণের সবর্ণগুলিকে যথেচ্ছ সংখ্যায় ব্যবহার বন্ধ করে একটিমাত্রের প্রয়োগ করা হলো। অনেক ভাবে তাদের স্থানের পৌর্বাপর্যের অদল বদল ঘটানো হলো। সেখানে ‘অ আ, ই ঈ, উ ঊ, ঋ ৠ, ৯ ৡ’ এদের একটি মাত্রকেই গ্রহণ করা হলো। তেমনি ব্যঞ্জনবর্ণগুলির ক্রমের অনেকের স্থানেই পৌর্বাপর্যের পরিবর্তন করা হলো, এবং অবশ্যই সেটা করা হলো নানান ব্যকরণের টেকনিকাল টার্ম তৈরির জন্য। এর সমর্থনে অনেক যুক্তি আছে। **পাণিনির মতে—স্বর নয়টি, ব্যঞ্জন ৩৪টি, মোট ৪৩টি। যাই হোক পাণিনি** প্রবর্তিত এই নতুন পথে—চতুর্দশ মাহেশ্বর সূত্র ও অচ্‌-আদি প্রত্যাহার ব্যবস্থা। সংস্কৃত ব্যাকরণচর্চার ক্ষেত্রে যা সবথেকে জনপ্রিয়। এখানে—‘অ ই উ ঋ ৯ এ ও ঐ ঔ’ এই নয়টি মাত্র স্বরের গ্রহণ করলেন তিনি। এবার আসা যাক আধুনিক কালের বাংলা বর্ণমালা প্রসঙ্গে ১৭৬৭ তে হালেদ সাহেব (হ্যালহেড)-এর বাংলা ব্যাকরণ বইয়ে ১৬টি স্বর (অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ৯ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ), **মদনমোহন তর্কালঙ্কার** মহাশয়ের বইয়ে ওই একই ১৬ সংখ্যা ছিল। **বিদ্যাসাগর** এই সংখ্যা কমিয়ে ১২তে (অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ) নামালেন। **রামসুন্দর বসাক**-এর বাল্যশিক্ষা বইটি ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয়, যাতে ১২টি স্বর গ্রহণ করা হয়। **তারাচাঁদ দাস**ও ১২টি স্বর গ্রহণ করলেন বিদ্যাসাগরের অনুকরণে। এদের প্রত্যেকটিতেই ৯-কারের গ্রহণ করা হয়েছে। এমনকী পাণিনির মতো ভাষাতাত্ত্বিকেরও যাঁর এত সংক্ষেপ প্রিয়, তিনিও ৯-কারকে ত্যাগ করতে পারলেন না। পরবর্তীকালে **বিদ্যাসাগর** ৯-বর্ণকে বাদ দিয়ে ১১টি স্বরবর্ণ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ক্ষ, ব (অন্তস্থ)-দেরও ব্যঞ্জনবর্ণ থেকে বাদ দিলেন সেখানে এদের ব্যঞ্জনবর্ণের পাঠে গ্রহণ করলেন, সেসব কথা অন্য কোথাও আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রসঙ্গত ‘৯-কারের বাংলাভাষায় ব্যবহার নেই’-এই তর্কে বর্ণমালা থেকে তার বহিষ্কার করা হয়েছে পরবর্তীকালে। প্রশ্ন জাগে, শিক্ষার তদানীন্তন উদ্দেশ্য এবং আজকের উদ্দেশ্যে অনেক ফারাক আছে, সে কথা ভুলে গেলে চলবে কেমন করে। যেমন হালেদ স্পষ্টকরে বলেছেন যে—

“বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং<br>
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং<br>
ক্রিয়তে হালেদংগ্রেজী<br>
ইন্দ্রাদয়োঽপি যস্যান্তং ন যযুঃ<br>
শব্দবারিধেঃ।<br>
প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমো বক্তুং নরঃ<br>
কথম্।।”

অর্থাৎ ইংরেজদের উপকারের জন্য শব্দবোধপ্রকাশ শব্দশাস্ত্র রচনা করছেন হালেদ, ....... ইন্দ্রাদিরাও যে শব্দবারিধির শেষ নির্ণয় করতে সমর্থ হননি, প্রক্রিয়াক্রম নির্ণয়কারী পাণিনির তুল্য ব্যাকরণ রচনা করার মতো মানুষ কোথায়? সেকালে ঔপনিবেশিক কলকে পাবার তাড়না থাকা সত্ত্বেও কোথাও একটি স্বতন্ত্র সত্যপ্রকাশের তাগিদ দেখা যেত। আজ কোনো পরাধীনতার বাঁধন না থাকলেও কোথায় যেন সেই সত্যপ্রকাশের (শব্দবোধপ্রকাশক) তাড়নাটা হারিয়ে ফেলেছি আমরা।

‘৯’ -কার সন্ধির কারণে ‘ল’ হতেই পারে। সন্ধির কথা ছেড়েই দিতে হয়, কারণ অ + ই = এ হয়, তাই বলে একার কে স্বরবর্ণমালা থেকে বাদ দিয়েছি কি? এমনকী ঋ—৯ এদের সবর্ণ বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও এদের পৃথক রূপে পাণিনি বর্ণসমাম্নয়ে গ্রহণ করেছেন।

এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসবে তবে, আদর্শ বর্ণমালা কী হবে? আমার মতে—

**অ ই উ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ (নয়টি) স্বরবর্ণে এরাই যথেষ্ট। অথবা অধিক পক্ষে অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ৯ এ ঐ ও ঔ (তেরোটি) এদেরকে পর্যাপ্ত বলা যেতে পারে।**

কেন এরূপ তেরোটির গ্রহণ? এই প্রশ্ন উত্থাপনের আগেই ব্যাখ্যান উপস্থাপন বিধেয়। আগেই বলা হয়েছে অ থেকে ঋ এরা আঠারো প্রকার। এবং ৯ থেকে ঔ বারো প্রকার। ৯-র দীর্ঘ হয় না। এ থেকে ঔ এদের হ্রস্ব উচ্চারণ হয় না। কারণ এ-কার থেকে ঔ-কার এরা প্রত্যেকে অন্য অন্য স্বরেদের মিশ্রণে উৎপন্ন, এরা মৌলিক স্বর নয়, এদের উচ্চারণ ক্রমও তথাবিধ। উচ্চারণ স্থান প্রযত্নকরণ ইত্যাদির উপরে নির্ভর করে, লাঘবতার কারণে সে আলোচনা এখানে বোধ হয় অপ্রয়োজনীয়। এখানে বরং শিশুপাঠ্যকে নিশ্চিত করা উচিত, যে শিশুর জন্য কোনটি যথার্থ পাঠ্য। তারা কণ্ঠস্থ করার জন্য ১৩টিকেই পড়ুক। তবে ৯-কারকে বাদ দিয়ে ১২টি নয় কেন? ঠিক যে কারণে জন্মের পরে মাতৃদুগ্ধ ও মাতৃদেশস্পর্শের এক গভীর প্রয়োজন শিশুর জন্য, এখানেও সেই একই বক্তব্য। কেননা এর পরে আবার নতুন করে ৯ বর্ণের পরিচয় করালেও তা ততটা শ্রদ্ধাযুক্ত হবে না। অনেকেই সে যুক্তি মানতে চান না, তারা ৯-বর্ণের সম্পূর্ণ বর্জনের পক্ষপাতী।

এখানে প্রশ্ন জাগে, তবে কি আজকাল সত্যই উত্তরকালে প্রমাণযোগ্য মুনিদের আবির্ভাব হলো? হতেই পারে, পাণিনি নিজেও বলেছেন উত্তরকালের বৈয়াকরণদের মতই প্রমাণ। দেখা যাক উত্তরকালে (বর্তমানে) কী ঘটছে। ভারত সরকার এমনকী নাসাও ষষ্ঠ তথা সপ্তম জেনারেশনের সুপার কম্পিউটারের জন্য সংস্কৃত ভাষাকেই গ্রহণ করেছে। এখন কলকে পেতে অথবা সত্যার্থেও সংস্কৃতজ্ঞান দরকার হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় উত্তরকালে যদি কম্পিউটার জানা আবশ্যিক হয়, তবে সম্ভবত সংস্কৃত না জানলে পেটের ভাত জোটানো দুষ্কর হবে। অবশ্য এখন যেমন ইংরেজি না জেনে কম্পিউটার চালাতে পারি না, তেমন তার থেকে ভালো কোনো স্থিতি আসবে তখন। এখন বলুন এই শিক্ষার উদ্দেশ্য কী? সত্যলাভার্থ অথবা উদরপূরনার্থ? যেটাই হোক না কেন শিক্ষায় আমাদের মনোদ্বার উন্মুক্ত থাকুক। একটি লিপি, কোনো একটি মাত্র ভাষা শেখানোর কাজে ব্যবহারের উপযোগী বলে প্রতিপন্ন হয়ে থাকবে। কেন সেই লিপিতে ইতরেতর ভাষাগুলি লেখার সামর্থ্য হবে না। আর যদি তা না হয়, তবে কালে তা হারিয়ে যাবে।

একটি উদাহরণ দিই। আমাদের ঙ ঞ ণ ন ম অঃ অঁ সাতটি নাসিক্য ধ্বনিঃ। তাদের কেবল n ও m এই দুটি নোজাল টোন। যা দিয়ে এই সবগুলিকে প্রকাশ করতে হয়। এতগুলি নাসিক্য ধ্বনিকে রোমান লিপিতে প্রকাশ করতে নাকানি-চোবানি দশা হয়। তাই তারা ডায়াক্রেটিক মার্কের আমদানি করেছে। যেমন ঙ =na, ঞ = na, ণ = na, ন na, ম = ma, অং =am, অঃ = ah, আমরা সেখানে নিজেদের বর্ণমালা থেকে বর্ণদের ত্যাগ করে হালকা হতে চাইছি, যা কিনা মূর্খতার পর্যায়বাচি। তবে এদিকেও একটু দৃষ্টিপাত করুন।

এই যে বাদ উঠছে যে... ণ-ন, জ-য, ৰ-ব, শ-ষ-স ... এসব বর্ণগুলির একটিই গ্রহণ করলেই যথেষ্ট। এর জন্য ৯-কার পরিত্যাগকারী পক্ষ কি এই লাঘব পক্ষকেই অবলম্বন করবেন? সম্ভবত অনেকেই সেইমতে দ্বিমত পোষণ করবেন। আজ এই মত বহুলভাবে উঠে আসার পিছনের কারণও সেই একই সংস্কৃত শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়া ও স্বরাষ্ট্রবিরোধী তথা সামাজিক বিভেদকামী শক্তিকর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষানীতি দীর্ঘদীন প্রচলিত থাকা। যাঁরা সে বিষয়ে মত পোষণ করেন তাঁরা বলেন যে আমার না জানা আমার দায় (অহংকারও হতে পারে, কলঙ্কও হতে পারে), তাই বলে আমার না জানাকে আমি সত্য বলে দাবি করতে পারি না, আমি জানি বা না জানি আমি প্রয়োগ করি বা না করি তাতে সত্য পরিবর্তিত হয়ে যায় না, অতএব **শিক্ষা থাক সত্যান্বেষণের লক্ষ্যে উদার ও উন্মুক্ত।** বাংলা লিপি অথবা বাংলাভাষা ভারতের অখণ্ড সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন অঙ্গস্বরূপ। এতে সংযোজন-বিয়োজন হতেই পারে। মানুষ কালের স্রোতে অনেক কিছু নতুন করে বলতে থাকে শিখতে থাকে, একই ভাবে ভুলতেও থাকে। কিন্তু যে স্বরাষ্ট্র, সংস্কৃতি, স্বতন্ত্রতা, সভ্যতা ... আমাদের এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে, আশ্রয় দিয়ে রেখেছে, শিক্ষা হোক তা রক্ষার কর্তব্যে নিবেদিত, তা সে ভাষা হোক বা গণিত হোক, বিজ্ঞান হোক বা ভূগোল, ইতিহাস হোক বা দর্শন, সব বিষয়ের পাঠনের সময় সেই চরম সত্যকে ভুলে গেলে চলবে না। তাই ভাষার বর্ণমালা কেবল কতকগুলি ধ্বনির প্রকাশক মাত্র নয়, তা হলো আমাদের অখণ্ড সভ্যতা, সংস্কৃতির প্রকাশক। একথা ভুলে গেলে চলবে না। যদি এমনটাই হয়, তবে আগামীদিনে কোনও বঙ্গসন্তান 'ৰালকোহয়ং কৢপ্তঃ বিদ্যতে' (কৢপ্ত = সুসজ্জিত) বাক্যটি আর লিখতেই জানবে না। লিখতে জানবে না যে, চলতি (চলা) ক্রিয়াপদটির মূল ধাতু চ্লৄ, বেলতি (বেলা) ক্রিয়াপদটির মূল ধাতু বেল৯, কেলতি (চলন) ক্রিয়াপদটির মূল ধাতু ক্লৄ, খেলতি (খেলা) ক্রিয়াপদটির মূল ধাতু খ্লৄ। বর্গীয় ৰ এবং অন্তঃস্থ ব-তো এখনই আমরা ভুলে মেরে দিয়েছি। কিন্তু সমগ্র ভারতে এই দুই ব-কারের পার্থক্য সযত্নে উচ্চারিত হয়, আমাদের গর্বের অনেক কিছুই আছে। তাই বলে দোষগুলিকে দেখবো না, এটা সত্যের অপলাপ মাত্র, ভণ্ডামি, পাখণ্ড, পাপাচার। পাণিনীয় শিক্ষায় অন্যান্য বৈয়াকরণরা এসকল বিষয়ে বিস্তারিত বলেছেন, হারিয়ে যাওয়া বিষয় নয়, এগুলি চর্চা করলেই সব ফিরে আসে। এখন প্রসঙ্গ হলো এগুলোর প্রয়োজন কী? সত্যার্থ বললে নাসিকা কুঞ্চন যারা করতে পারেন, তাদের জন্য বলি—রুটি-রুজির জন্য করুন আগে। ভালো দিন আসছে সংস্কৃত জানা লোকেদের জন্য। তাই বাঙ্গালি শিশু সেই যুদ্ধে পিছিয়ে যাতে না পড়ে, তাই শৈশবেই তাদের প্রবঞ্চিত হতে দেবেন না। যে শিশুপাঠ্য পুস্তকে ৯-কার নেই, জানবেন ওই পাঠ্যক্রমের প্রণেতা সেই বিধ্বংসকারী চিন্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জেনে অথবা না জেনেই কেবল বাঙ্গালিকেই নয় ভারতীয়দের ধ্বংস করতে চাইছে।

সত্যার্থের কথায় আসা যাক, আমরা পরম ব্রহ্মে বিশ্বাসী। জগৎকে অখণ্ড সত্তার অঙ্গরূপে জানি। সেখানে সবটাই অখণ্ডমণ্ডলের অঙ্গীভূত। সেই সত্যরূপ পরম জ্ঞানের লাভকেই আমরা জীবনের পুরুষার্থ বলে মানি। এই জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এমন কী স্বয়ং বিধাতা পুরুষ নচিকেতা, নাভানেদিষ্ট, প্রহ্লাদ, ধ্রুবদেরকেও তা দান করতে পারেননি, তাদের তা অর্জন করতে হয়েছিল। ছাত্রীতুল্যা পরমপ্রিয়া পত্নী মৈত্রেয়ীকেও তা দান করতে পারেননি, কেবল বর্ণনা করেছেন যাজ্ঞবল্ক্য। ঋষিরা তার জ্ঞাতা হলেও তা প্রকাশ করেননি। সম্ভবত তা প্রকাশ করার সামর্থ্য কারও হয়নি। পাণিনি আদি বৈয়াকরণরা বললেন, এই ধ্বনিই পরমব্রহ্ম। সেই জন্যই ব্যঞ্জনযুক্ত সানুস্বর অথবা স্বরকেই অক্ষর বলা হয়। সেই অক্ষরই পরমব্রহ্ম। তাকেই লোপ ঘটানোর মতো ঋষি হয়ে গেলাম আমরা!! বটে, তা বেশ, তা বেশ!!

*(লেখক সংস্কৃতশিক্ষক, কালিনগর মহাবিদ্যালয়)*


## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই
স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।
টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

| | | |
|---|---|---|
| Account Name | : | **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.** |
| A/C. No. | : | **917020084983100** |
| IFSC Code | : | **UTIB0000005** |
| Bank Name | : | **AXIS Bank Ltd.** |
| Branch | : | **Shakespeare Sarani, Kolkata** |

# ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস এসেছেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে। প্রথমেই ঠাকুর বললেন, আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হদ্দ নদী দেখেছি। এবার সাগর দেখছি। বিদ্যাসাগর বললেন, তবে খানিকটা নোনাজল নিয়ে যান। ঠাকুর বললেন, না গো, নোনাজল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি ক্ষীরসমুদ্র। বিদ্যাসাগর বললেন, কেমন করে? ঠাকুর বললেন, আলু পটোল সিদ্ধ হলে তো নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার খুব দয়া।'

একই সঙ্গে বিদ্যা ও দয়া দুটো সাগরের সম্মিলন গত দুশো বছরের মধ্যে খুব কম মনীষীর মধ্যে দেখা গিয়েছে।

১৮৫১ থেকে ১৮৭২ এই ২১ বছর যে মানুষটি তৎকালীন হিন্দু সমাজের একমাত্র কর্ণধার ছিলেন, হিন্দু সমাজের কুপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তাঁর জীবন কিন্তু সোনার চামচ মুখে দিয়ে শুরু হয়নি। হতদরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নেওয়া, না খেতে পাওয়া একটি ছেলে সীমাহীন জেদ আর অকল্পনীয় মেধার জোরে বিদ্যার সাগর হয়েছিলেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাবার আকাশছোঁয়া ইচ্ছা। বারো বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়ে ছ'মাসে ন্যায়শাস্ত্র, ন'মাসে স্মৃতিশাস্ত্র, কালিদাস, ভবভূতি, সাংখ্য, কল্প সমস্ত বিষয়ে দুর্দান্ত রেজাল্ট করে উঠতে লাগলেন। পড়ার সময় বাবা কাছে বসে থাকতেন। দিনের পর দিন মাত্র দু থেকে তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন। পড়তে পড়তে চোখে ঘুম নেমে এলেই পিঠে পড়তো চেলাকাঠ। হাতের কাছে যা পেতেন তাই দিয়ে মারতেন বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুত্র সাধ পূরণ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত হলেন তিনি।

মাত্র ২১ বছর বয়সে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে হেড পণ্ডিতের পদে যোগদান করেন। পাঁচ বছর যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে সংস্কৃত কলেজে সহ সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের

সঙ্গে বনাবনি না হওয়ায় এক বছর পর ইস্তফা দেন। সম্পাদক রসময়বাবু বলেছিলেন চাকরি ছেড়ে করবে কী? দৃঢ়চেতা স্বাভিমানী বিদ্যাসাগর বলেছিলেন বাজারে আলু পটোল বেচে খাব। আলু পটোল বেচতে হয়নি তাঁকে। বন্ধু মদনমোহন তর্কালংকারের সঙ্গে মিলে ছাপাখানার ব্যবসা শুরু করলেন। সংস্কৃত কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় বিদ্যাসাগরকে ডেকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব দিলেন। সেই সঙ্গে বেশ কয়েকটি জেলার স্কুল পরিদর্শকেরও দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হলো। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি আমূল সংস্কার করলেন। শিশু শিক্ষার জন্য বর্ণ পরিচয় রচনা করলেন। বিভিন্ন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে সরল অনুবাদ করলেন। তাঁকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক বলা হয়।

মানুষের প্রতি দয়ার মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মেট্রোপলিটন স্কুলের ছাত্র। খুব গরিব ঘরের ছেলে। বিনা পয়সায় বই পাওয়ার জন্য স্কুলের লাইব্রেরিয়ানকে চিঠি দিয়েছে। লাইব্রেরিয়ান সেই চিঠি না পড়েই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। মেট্রেপলিটন স্কুলের সর্বময় কর্তা বিদ্যাসাগরের কানে যেতেই লাইব্রেরিয়ানকে ছাঁটাই করা হয়। গরিব দুঃখীদের জন্য সবসময় তাঁর মন কেঁদে উঠত। সেকালে বালিকাদের কম বয়সে বুড়োদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হতো। কিছুদিন পরেই তারা বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি চলে আসত। সমাজপতিদের নির্দেশে তখন তাদের কঠিন কঠিন সব নিয়ম পালন করতে হতো। সেই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তাদের বেশিরভাগই আত্মহত্যা করত, কেউ কেউ ব্যাভিচারিণী হতো। বিদ্যাসাগর বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করে দেখালেন যে, বিধবাদেরও বিয়ে দেওয়া যায়। তিনি নিজের পুত্রের সঙ্গে এক বাল্যবিধবার বিয়ে দিয়ে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াছিলেন। এর জন্য বহু লাঞ্ছনা গঞ্জনা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত একবার বিদেশে খুবই অর্থকষ্টে পড়েছিলেন। দেনার দায়ে তাঁর জেল হবে। পুলিশ গ্রেপ্তার করতে এসেছে। পুলিশকে তিনি বললেন একটু অপেক্ষা করুন বিকেলের ডাকে ভারত থেকে একজন টাকা পাঠাবেন। পুলিশ অফিসার বললেন কে সে? মধুসূদন বললেন, ' তাঁর জ্ঞান প্রাচীন ভারতের মুনিঋষিদের মতো, কর্মশক্তিতে ইংরেজদের মতো আর বাঙ্গালি মায়েদের মতো তাঁর হৃদয়।' দেখা গেল সত্যিই বিকেলের ডাকে টাকা এসেছে। জানা গেল কলকাতায় তিনি তাঁর প্রেস বন্ধক রেখে টাকা পাঠিয়েছেন। তিনি বিদ্যাসাগর।

**রাজদীপ মিশ্র**

## ভারতের পথে পথে

# নৈমিষারণ্য

দেবী ভাগবতে রয়েছে, কলির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেতে ষাট হাজার মুনি-ঋষি প্রজাপতি ব্রহ্মার নিক্ষেপিত চক্রনেমির ভূমিস্পর্শ ক্ষেত্র উৎপল অরণ্যে এসে সাধনভজন শুরু করেন। নেমি থেকে উৎপল অরণ্যের নাম হয় নৈমিষারণ্য। স্তানীয় লোকেরা নিৱমষার বলে থাকেন। সেখানে চক্রতীর্থ সরোবর রয়েছে। পুরাণ মতে কথিত, গৌরমুখ মুনি এক নিমেষে অসুর ভস্মীভূত করেন বলে নৈমিষারণ্য নাম হয়েছে। এখানকার গোমতী নদীর জলে স্নান করলে পুণ্য লাভ হয়। সরোবর ঘিরে অসংখ্য মন্দির রয়েছে। একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম ললিতাদেবীর মন্দির রয়েছে এখানে। রয়েছে ব্যাসপীঠ। পুরাকালে জগদ্‌গুরু ব্যাসদেবের পৌরোহিত্যে এখানে ধর্মসংসদের অধিবেশন বসত। চক্রতীর্থের দক্ষিণ- পশ্চিমে গোমতীর তীরে বিরাট রাজার দুর্গের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। বনবাস কালে পাণ্ডবরা এখানে বাস করেন। মূর্তি রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ-সহ পঞ্চপাণ্ডবের। রয়েছে হাজারটি শিবলিঙ্গের নাটমন্দির।

## জানো কি?

**কোন খেলায় প্রতি দলে কতজন খোলোয়াড় প্রয়োজন**

● বাস্কেটবল--৫, ● ফুটবল-- ১১, ● হকি--১১,

● ওয়াটার পোলো--৭, ● কাবাডি--৭, ● খো খো-- ৯।

● পোলো--৪, ● ভলিবল--৬, ● ক্রিকেট-- ১১।

● টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, ক্যারাম-- ১ অথবা ২

● দাবা-- ১, ● হ্যান্ডবল-- ৭।

## ভালো কথা

# স্বচ্ছ ভারত

নবাঙ্কুরের পাতায় শ্রেয়সী চৌধুরীর আবেদন আমাকে খুব ভালো লেগেছে। আমার শুধু মনে হচ্ছে পশুপাখিরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছ ভারত অভিযান যেখানে মেনে নিয়েছে, সেখানে আমরা মানুষ হয়ে কেন পারছি না। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখলাম, একটা কাক রাস্তায় পড়ে থাকা প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ ঠেঁটে করে নিয়ে গিয়ে ডাস্টবিনে রাখছে। আর একটিতে দেখলাম, উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে মানুষের ফেলে দেওয়া ক্যারিব্যাগ বনের হাতি শুঁড়ে করে নিয়ে পাথরে চাপা দিয়ে রাখছে। বাঁদর ট্যাপকল খুলে জল খেয়ে আবার কল বন্ধ করে দিচ্ছে। এসবের সত্যমিথ্যা জানি না। কিন্তু আমার খুব ভালো লেগেছে। শুধু মনে হচ্ছে আমরা কি জন্তুজানোয়ারের থেকেও অধম? নবাঙ্কুরের ছোটো বন্ধু শ্রেয়সীর মতো আমিও ভালো কথার মাধ্যমে সবাইকে প্লাস্টিক বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেশকে স্বচ্ছ রাখার আবেদন জানাচ্ছি।

**সুনন্দা সেন, দ্বাদশ শ্রেণী, কল্যাণী, নদীয়া।**

*তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।*

## কবিতা

# আলতা মাসি

**সমন্বিতা সাহা,** ষষ্ঠ শ্রেণী, মঙ্গলবাড়ি, মালদা।

আলতা মাসি আলতা মাসি
যাচ্ছো কোথায়, গয়া কাশী?
খাচ্ছো কী, লুচি, বাসি?

আলতা মাসি আলতা মাসি
তোমার মুখের মিষ্টি হাসি,
আমি বড়োই ভালোবাসি
তাইতো তোমার কাছে আসি।

**উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়**

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

*ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।*

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

# ।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ৭।।

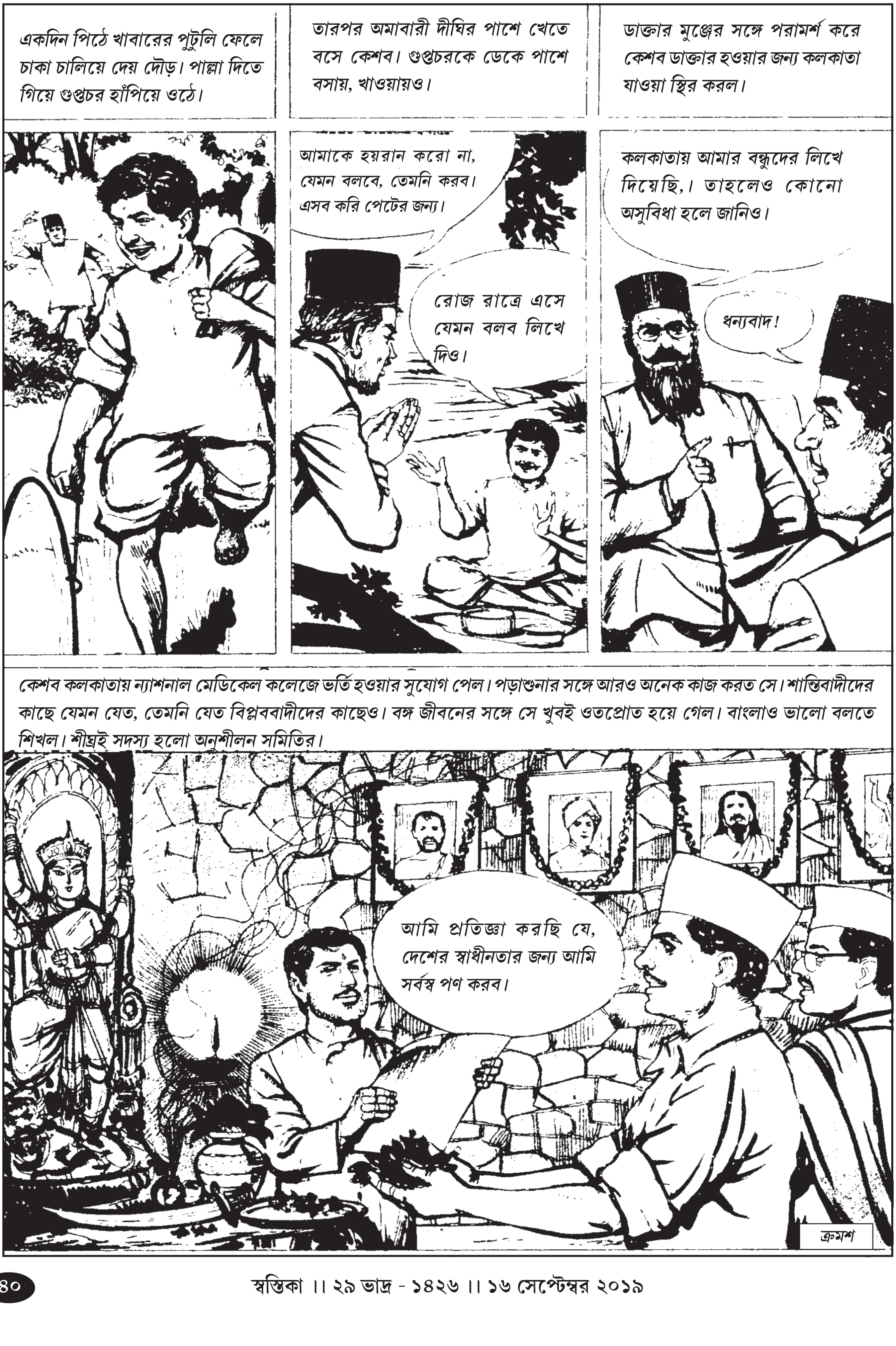

# মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের চণ্ডীপাঠ

**দিলীপ পাল**

মহালয়ার ভোরে দেবীর আবাহনে চণ্ডীপাঠ থেকেই প্রকৃত পূজা শুরু হয়ে যায়। পাহাড় থেকে সাগর সর্বত্র বাড়িতে বাড়িতে, ক্লাবে ক্লাবে ধ্বনিত হয় তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর। তিনি আকাশবাণীর 'মহিষাসুরমর্দিনী'-র ভাষ্যকার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ছিলেন একজন বিশিষ্ট ভারতীয় বাঙ্গালি। তিনি ছিলেন বেতার সম্প্রচারক, নাট্যকার, অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক। তিনি উত্তর কলকাতার বাসিন্দা। কাজী নজরুল ইসলাম ও পঙ্কজ কুমার মল্লিকের সমসাময়িক। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ১৯৩০-এর দশক থেকে সুদীর্ঘকাল অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর বেতার সম্প্রচারকের কাজ করেন। এই সময় তিনি অনেক নাটক রচনা ও প্রযোজনাও করেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের সর্বাধিক পরিচিতি তাঁর 'মহিষাসুরমর্দিনী' নামক বেতার সঙ্গীতালেখ্যটির জন্য। ১৯৩৯ সাল থেকে আকাশবাণীতে 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হয়ে। আসছে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এই অনুষ্ঠানের ভাষ্য ও শ্লোকপাঠ করতেন। তিনি একাধিক নাটকে অভিনয় ও পরিচালনার কাজও করেছেন। ১৯৫৫ সালে 'নিষিদ্ধ ফল' নামে একটি চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন।

১৯০৫ সালের ৪ আগস্ট উত্তর কলকাতার মাতুলালয়ে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন রায়বাহাদুর কালীকৃষ্ণ ভদ্র ও মা ছিলেন সরলাবালা দেবী। পরবর্তীকালে ঠাকুমা যোগমায়া দেবীর কেনা ৭নং রামধন মিত্র লেনে উঠে আসেন তাঁর পরিবারবর্গ। কালীকৃষ্ণ ভদ্র ছিলেন বহু ভাষাবিদ। তিনি ১৪টি ভাষা জানতেন। নিম্ন আদালতে দোভাষীর কাজ করতেন তিনি, পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্য জগতে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক পরিচিত ব্যক্তিত্ব। কালীকৃষ্ণ পুলিশ কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী কালীচরণ ঘোষের দ্বিতীয় সন্তান সরলাবালা দেবীকে বিয়ে করেন। ১৯২৭ সালে তিনি রায়বাহাদুর খেতাব পান। কালীকৃষ্ণের দুই পুত্র— বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ও ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ১৯২৬ সালে ইন্টারমিডিয়েট ও ১৯২৮ সালে কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে স্নাতক হন।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র একাধিক ধ্রুপদী কাহিনিকে বেতার নাট্যের রূপ দেন। ১৯৩০-এর দশকে তিনি যোগ দেন অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে। এই সময় থেকেই দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেবী দুর্গার পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে দুই ঘণ্টার সঙ্গীতালেখ্য 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হন তিনি। এই অনুষ্ঠানটির গ্রন্থনা করেছিলেন রাণীকুমার এবং সংগীত পরিচালনা করেছিলেন পঙ্কজ কুমার মল্লিক। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভাষ্য ও শ্লোক পাঠ করেন। আজও দুর্গাপূজা শুরু হয় 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ 'মেস নং ৪৯' সহ একাধিক নাটক রচনা করেন। বিমল মিত্র-র 'সাহেব-বিবি-গোলাম' নাটকটি তিনি মঞ্চস্থ করেন। ১৯৫২ সালে 'সুবর্ণ গোলক' (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) গল্পটিকে তিনি নাট্যায়িত করেন। আজও দুর্গাপূজার সূচনায় অর্থাৎ মহালয়ার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র-এর 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানটির রেকর্ড আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। এই অনুষ্ঠানটি বর্তমানে এতটাই জনপ্রিয় যে, ১৯৭৬ সালে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ বীরেন্দ্রকৃষ্ণের পরিবর্তে টলিউডের মহানায়ক উত্তমকুমারকে দিয়ে অন্য একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি ঘটা করে সম্প্রচারিত করলে তা জনমানসে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায়, আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ সেই অনুষ্ঠানটির পরিবর্তে মূল 'মহিষাসুরমর্দিনী' (বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের ভাষ্যপাঠ) অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত করতে বাধ্য হয়। ২০০৬ সালে মহালয়ার দিন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কন্যা সুজাতা ভদ্র সা-রে-গা-মা ইন্ডিয়া লিমিটেডের তরফ থেকে তাঁর পিতার এই মহান কীর্তির রয়্যালটি স্বরূপ ৫০,৯১৭ টাকার একটি চেক পান।

তাঁর অন্যান্য রচনাগুলি :

হিতোপদেশ—১৯৪৮,

বিশ্বরূপদর্শন—১৯৬৩,

রানা-বেরানা—১৯৬৫,

ব্রতকথা সমগ্র—১৯৮৫,

শ্রীমদ্ভাগবত সম্পূর্ণ দ্বাদশ স্কন্ধ, উপেশচন্দ্র শাস্ত্রীর সঙ্গে ১৯৬০ সাল।

নাটক :

ব্ল্যাক আউট, সাত তুলসী—১৯৪০ সাল।

# অবহেলিত মাতৃশক্তির ক্ষমতায়ন

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** মারাঠি উচ্চারণে অমৃতা হয়ে যায় অম্রুতা। কিন্তু মানে বদলায় না। মানেটা আরও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন অমৃতা কারওয়াণ্ডে। তার জীবন থেকে ভুবনবন্দিত সিনেমার উপাদান সংগ্রহ করতে পারেন কোনও চিত্রনাট্যকার। তিনি হয়ে উঠতে পারেন আত্মপরিচয়ের সন্ধানে যুদ্ধরত যে কোনও মানুষের প্রেরণা। সব থেকে বড়ো কথা, যে বয়েসে সবাই বিশ্বাস করতে শেখে ঠিক সেই বয়েসে মানুষের নিষ্ঠুরতা অমৃতার বিশ্বাস ভেঙে দিলেও তিনি হারিয়ে যাননি। গ্লানি ক্লেদ সব ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং ঘুরেও দাঁড়িয়েছেন।

কিন্তু কে এই অমৃতা কারওয়াণ্ডে? কী তার পরিচয়? মানুষের পরিচয় বলতে যদি বাবা-মা'র নামধাম ইত্যাদি বোঝায় তাহলে বলতে হয় অমৃতার কোনও পরিচয় নেই। কারণ মাত্র দু'বছর বয়েসে ওকে পরিত্যাগ করা হয়েছিল। বাবা-মা'র নাম ঠিকানা— এমনকী তাদের কেমন দেখতে, তাও আজ আর অমৃতার মনে পড়ে না। কিন্তু তাতে কী! পরিচয় যদি জন্মসূত্রে না মেলে তাহলে মানুষের লড়াইটা হয়ে ওঠে আত্মপরিচয় অর্জনের। কাজটা কঠিন, সবাই পারে না। মহাভারতের কর্ণের মতো, অমৃতা কারওয়াণ্ডের মতো কেউ কেউ পারেন। নিঃসন্দেহে অমৃতা পেরেছেন। অনাথ শিশুরা যাতে লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, সরকারি সুযোগসুবিধে থেকে যাতে তারা বঞ্চিত না হয়— তার জন্য নিরলস চেষ্টা করেছেন অমৃতা। সফলও হয়েছেন। মহারাষ্ট্র সরকার অমৃতার দাবি মেনে রাজ্যে অনাথদের জন্য ১ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করেছে।

স্বভাবতই অমৃতা খুশি। কিন্তু আত্মপ্রসন্ন নন। কারণ তিনি অতীত ভোলেননি। সেইসব দিন সম্বন্ধে জানতে চাইলে বলেন, 'শৈশবের যেসব স্মৃতি আমি মনে করতে পারি তার উৎস গোয়ার অনাথ আশ্রম মাতৃছায়া। আমার যখন মাত্র দু'বছর বয়েস তখন ওখানে আমাকে কেউ রেখে গিয়েছিল। আমার বাবা-মা'র কথা কেউই বলতে পারেনি। ছোটোবেলায় আমি আশ্রমের ভেতরে-বাইরে বাবা-মা'কে খুঁজে বেড়াতাম। জানতাম না কোথায় গেলে তাদের পাওয়া যাবে।'

অমৃতা আশ্রমেই বড়ো হচ্ছিলেন। ওকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। পড়াশোনা করছিলেন। কিন্তু ১৮ বছর বয়েসে হবার পর বেশ জটিল একটা পরিস্থিতি তৈরি হলো। অমৃতার কথায়,'আশ্রম কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিলেন ওরা আর আমার দেখাশোনা করতে পারবেন না। আমাকে বিয়ে করতে হবে। বিয়ে না করে চলে গেলাম পুনেতে। মনে আছে প্রথম রাতটা পুনে রেলওয়ে স্টেশনেই কাটিয়েছিলাম।' এরপর শুরু হলো কঠিন জীবনসংগ্রাম। বেঁচে থাকার জন্য অমৃতাকে লোকের বাড়িতে বাসন মাজা, বাথরুম পরিষ্কার করা, বাচ্চার দেখাশোনা করা— সব কাজই করতে হয়েছে। যখন যেখানে যে-কাজ পেয়েছেন, করেছেন। কাজটা ঠিকে ঝির নাকি হাসপাতালের আয়ার বাছবিচার করেননি।

এই সময় চরম একাকিত্ব গ্রাস করেছিল অমৃতাকে। এমনকী একবার আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিলেন। হয়তো এইভাবে শেষ হয়ে যেত একটা অসীম সম্ভাবনা। কিন্তু ঈশ্বর শেষ হতে দিলেন না। হঠাৎই একদিন অমৃতার সঙ্গে এক অন্ধ দম্পতির দেখা হয়ে গেল। অমৃতা বলেন, 'দিনটা ছিল খুবই খারাপ। এক কোণে বসে আমি আবার জীবন শেষ করার কথা ভাবছিলাম। হঠাৎই দেখলাম ওই অন্ধ দম্পতিকে, খেলনা বিক্রি করছেন। ভাবলাম, রুটিরুজির জন্য ওদেরও নিশ্চয়ই খুব কষ্ট করতে হয়। কিন্তু কই, ওরা তো আমার মতো হতাশ হয়ে পড়েননি! আত্মহত্যার কথাও ভাবেননি!' ঘুরে দাঁড়ানোর সেই শুরু। এরপর এক বন্ধুর সহযোগিতায় কলেজে ভর্তি হলেন। ২০১৭ সালে মহারাষ্ট্র পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় পাশ করলেন।

পড়াশোনা করতে করতেই অনাথদের জন্য কিছু করার ভাবনা মাথায় এসেছিল। যেখান থেকে বহু বাধা বিপত্তি পেরিয়ে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশের কাছে সংরক্ষণের প্রস্তাব। অমৃতার নাম এখন মহারাষ্ট্রে সুপরিচিত। ইতিহাস অমৃতাকে মনে রাখবে ওর মানবিক অবদানের জন্য। নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে বহু কথা হবে কিন্তু শক্তির এমন জাগরণ অমৃতারাই ঘটাতে পারবেন॥

# অমর্ত্যর মর্ত্যকথা

**অমিত দাশ**

ভারতবর্ষে ইদানীং মুড়ি-মিছরির এক দর ধার্য করবার প্রবণতার বিষয়ে মানুষের বিরক্তি এমন একটি পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, ক্ষোভ একালের দেহাতি কথোপকথনে রীতিমতো অশিষ্ট এক বাগধারার তুলনামূলক ভদ্র ভাষান্তর ‘নেতাজীতেও জি, পেঁয়াজিতেও জি— জাতীয় প্রতিক্রিয়ার আশ্রয় নিতে চায়— নেহাত রুচিতে বাধে, তাই বলা যায় না। পাগড়ির দৈর্ঘ্য দেখে মাথার ওজন নির্ধারণ করবার চেষ্টা এখন আর অজ্ঞ-মূর্খের একচেটিয়া নয়, কখনো কখনো তা দুষ্টুবুদ্ধি বুদ্ধিব্যবসায়ীদেরও উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়।

রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, এ পুরস্কারের প্রাপক আরও কেউ কেউ, কাজেই তুল্যমূল্য— এমন ভাবনায় ভাবিতের সংখ্যা তাই নিতান্ত সামান্য নয়। এই বিভ্রমের বশবর্তী হয়েই নোবেলপুরস্কার প্রাপকরা কেউ কেউ মনে করেন প্রভূত অভিজ্ঞতা ও সহজাত প্রজ্ঞার সাহায্যে যথার্থ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রবীন্দ্রনাথ যেমন মানুষকে পরামর্শ-উপদেশ দেওয়ার অধিকারী ছিলেন, ঠিক তেমনভাবেই তাঁদেরও উদ্দেশ্যমূলক ও পক্ষপাতিত্বপূর্ণ উপদেশ মানুষ শুনবেন। তাছাড়া ‘Myriad Mind Man’ ‘অসংখ্য বিষয়ে মনোনিবেশক্ষম মানুষ’ এমন যে অভিধা বিশ্ববাসী রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছেন, তা যাবতীয় নোবেল পুরস্কৃতের সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে না। কেউ যদি স্বয়ং নিজেকে সেরকম ভাবেন তাহলে তাঁর সম্পর্কে প্রযোজ্য বিশেষণ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য নিজেকে সর্বজ্ঞ ভাবতেন না। সহজাত প্রজ্ঞায় বিভিন্ন বিষয়ে মতামত জানালেও নোবেল পুরস্কারের মাধ্যমে বিশ্বখ্যাতি অর্জনের অন্তত বছর দু'য়েক পরেও রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা তাঁকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন— ‘শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে’।

নোবেল পুরস্কারকে রবীন্দ্রনাথ কিছু পরিমাণে বিড়ম্বনা বলেই মনে করেছেন। উইলিয়াম রদেনস্টাইন সাহেবের অভিনন্দনবাহী পত্রের উত্তরে লিখেছেন যে, লেজে কানেস্তারা বেঁধে দেওয়া কুকুরের পক্ষে যেমন শব্দের মাধ্যমে চারপাশে ভিড় না জমিয়ে চলাফেরা করা অসম্ভব। ঠিক তেমনভাবেই নোবেল-প্রাপ্তি মানুষের ভিড়ের সম্মুখীন না হয়ে তাঁর চলাফেরা দুঃসাধ্য করে তুলেছে।

কিছুদিন যাবৎ চিঠি ও টেলিগ্রামে তাঁকে চেপে ধরেছে এবং এ বিষয়ে সেই সকল মানুষের আনন্দের অভিব্যক্তিই বেশি, যারা তাঁর রচনার একটি লাইনও কখনো পড়ে দেখেননি।

(It is almost as bad as tying a tin can at dog's tail making it impossible for him to move without creating noise and collecting crowds all along.

I am being smothered with telegrams and letters for the last few days and the people who never read a line of my works are loudest in their protestation of joy.)

তাঁকে ঘিরে মানুষের উৎসাহ দেখে রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র)-কে এক পত্রে লিখেছেন— “...শুনেছে আমি নোবেল প্রাইজ পেয়েছি, মনে ভাবে সত্যিই বুঝি-বা মানুষটা কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে একটা কিছু হবে।”

১৯১৩-তে যখন রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান, তখন পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসা তথা শরীরবিজ্ঞান, বিশ্বশান্তি এবং সাহিত্যকৃতির জন্য এই পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। পুরস্কারটি আদৌ হেলাফেলার না হলেও পুরস্কার পেয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের মাথা ঘুরে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

যা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্ভব, তা আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়— তেমন বলা যাবে না। মাথা যে কারো কারো ঘুরে যায়, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’তে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের অনুবর্তন করলে তা প্রমাণিত হতে পারে।

আপাতত সংবাদে প্রকাশিত ব্যক্তির নাম ও পরিচয় উহ্য রেখে ‘মূর্ছার গপ্পে ক্ষুব্ধ’ শিরোনামে পরিবেশিত সংবাদটি একবার পড়ে নেওয়া যাক—

*বিশেষ সংবাদদাতা, বর্ধমান : মূর্ছা যাননি। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বুধবার বর্ধমানে নিজেই বললেন—। বিরক্ত— বলেই ফেললেন। “ঢাকায় একজন আমাকে শুইয়ে দিতে গিয়েছিলেন। আমি তাতে প্রচণ্ড রেগে যাই। শরীরে তেমন জোর থাকলে লোকটার দু'টো দাঁত খুলে নিতাম। দুর্ভাগ্য সেই ক্ষমতা আমার নেই।”*

*বড়োদিনের রাতে ঢাকায়— মূর্ছা যান বলে সবাই জেনে যান। এদিন বর্ধমানের সংস্কৃতি মঞ্চে অনুষ্ঠানে নিজেই প্রসঙ্গটি তোলেন। তিনি বলেন, “আপনারা দেখছেন তো আমি সুস্থ। সামনেই দাঁড়িয়ে আছি। ভুলেও ভাববেন না, আমি অসুস্থ।” অসুস্থতার খবর চাউর হতেই দেশ-বিদেশ থেকে ফোন আসতে থাকে। ---বলেন, “সবাইকে ভালো আছি বলতে বলতে আমি বিরক্ত।” কী ঘটেছিল সেই রাতে? —জানান, একগুচ্ছ বৈঠক, সভায় হাজির থাকতে থাকতে শরীরে ক্লান্তি ভর করে। তাই ‘ডিনার’ বাতিল করেন।*

*বিশ্রামের কথা শুনেই উদ্যোক্তাদের কেউ কেউ বেশি বিচলিত হয়ে পড়েন।*

অতিথি বিশ্রামের ইচ্ছা জানিয়ে ‘ডিনার’

বাতিল করছেন জেনে আতিথ্যদাতা বিচলিত হয়ে অতিথির জন্য শুয়ে বিশ্রাম করবার ব্যবস্থা করতে চাইলে অতিথির যদি আতিথ্যদাতার দাঁত ফেলে দেবার ইচ্ছে হয় তাহলে অতিথি শারীরিকভাবে সুস্থ হলেও মানসিকভাবে যে অসুস্থ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অসুস্থতার সংবাদ প্রচারিত হলে রাজনৈতিক নেতার আশঙ্কার কারণ ঘটে, পাছে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের মতো অবস্থা হয়, চলচ্চিত্র অভিনেতাদের গ্ল্যামার নষ্ট হবার ভয় থাকে— সংবাদে উল্লেখিত ব্যক্তি তেমনই কেউ নন। তিনি বিখ্যাত মানুষ— বিদ্যাবত্তার আকর্ষণে মানুষ তাঁকে ঘিরে ভিড় জমান, প্রকৃতপক্ষে তার কৃতিত্ব কী, তা না জেনেই। ভিড় তাড়ানোর জন্য রক্ষীও তাঁর আছে।

যাইহোক প্রকাশিত সংবাদটির শূন্যস্থানে যদি অর্থনীতিতে নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেনের নাম কেউ বসিয়ে দেন, তাহলে রে-রে করে ছুটে আসা দাঁত-নখসম্পন্ন বহু মানুষ পাওয়া যাবেই।

সংবাদটির প্রতিবাদ কোথাও বের হয়নি— অন্তত বর্তমান লেখকের চোখে পড়েনি বলে সংবাদটি সত্য বলে ধরে নিতে অসুবিধা নেই।

রবীন্দ্রনাথ তো বলেইছেন— ''সত্য যে কঠিন।''

প্রসঙ্গত, নোবেল পুরস্কারের সূচনালগ্নে অর্থনীতি বিষয়ে কোনো পুরস্কার প্রদানের পরিকল্পনা ছিল না। ১৯০১-এ নোবেল পুরস্কারের সূচনা হবার ৬৮বছর পর অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে এই পুরস্কার প্রবর্তিত হয়। স্বভাবতই পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য বহু পুরস্কারের তুলনায় অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার যথার্থই অর্বাচীন— ভুঁইফোড়। তবু নোবেলের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেই এর ভার যথেষ্ট।

অর্থনীতি বিষয়টি বর্তমান লেখকের অধিগম্য নয়। দেশের অর্থনীতি বিষয়ে অমর্ত্যবাবু কিছু বললে সে বিষয়ে কোনো প্রবন্ধ রচনা না করে বক্ষ্যমান লেখকের 'অধিকারীভেদ' মেনে নেওয়াই সঙ্গত হতো।

অমর্ত্যবাবু অর্থনীতি বিষয়ে সভা-সমিতিতে কিছু বললে তা অবশ্যই শুনতে বাধ্য হতো দেশের মানুষ। যদি যুক্তি দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক নেই বলেই তাদের তিনি কোনো পরামর্শ দিতে চান না, তা হলেও প্রশ্ন উঠে আসবে যে সকল রাজ্যসরকারকে তিনি পছন্দ করেন তাদের তিনি কোনো পরামর্শ দিয়েছেন বলে জানা যায় কি? অমর্ত্যবাবুর অর্থনীতি-বিষয়ক ভাবনার সঞ্চয়ে দেশকে দেবার মতো কিছুই নেই, এমনটা ভাবাই যায় না।

অপিচ কোনো অজ্ঞাত কারণে অমর্ত্যবাবু দেশের রাজনীতি নিয়ে বেশি কথা বলেন এবং সমালোচনার লক্ষ্য দেখে কেউ কেউ বলেন যে তা যথার্থই আশ্চর্যজনক। একটি বিশেষ দলের বিরুদ্ধেই নিজের সমালোচনার অস্ত্রকে শান দিয়ে সামান্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেও অমর্ত্যবাবুর কোনো ভুল হয় না অথচ মুসলমান মহিলাদের জীবনের অন্যতম প্রধান বিড়ম্বনা 'তালাক' নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে যে আলোচনা চলেছে, তার জন্য একটি কথাও খরচ করবার সময় পান না। কোন মহিলা মঙ্গলসূত্র কিংবা সিঁদুর পরবেন, তা ঠিক করে দেবার বিষয়ে ধর্মান্ধদের ফতোয়া, রাজ্যে যে-কোনো সরকারি কাজে ঘুষ-প্রদান ব্যবস্থাকে একেবারে অলিখিত আইন করে তোলা ইত্যাদি বিষয়েও অমর্ত্যবাবু কোনো কথা কখনো বলেছেন বলে জানা যায়নি। নিজেকে গণতন্ত্রের বড়ো প্রবক্তা হিসেবে জাহির করতে উৎসাহী অমর্ত্যবাবু পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে গণতন্ত্রের জবাই প্রত্যক্ষ করেছেন--- প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল তো বটেই, আদালতসমূহ ক্ষোভ প্রকাশ করলেও অমর্ত্যবাবু মৌনব্রত অবলম্বন করছেন। অমর্ত্যবাবুর বিবেক কখন জেগে উঠবে তা সে যথার্থই লাখ টাকার প্রশ্ন। দেশের জরুরি অবস্থার সময় অমর্ত্যবাবুর কোনো ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়নি। শাহবানু মামলা, তসলিমার বিতাড়ন-পর্ব, মরিচঝাঁপির অত্যাচার, আনন্দমার্গী হত্যা ইত্যাদি অজস্র বিষয়ের কোনোটিতেই অমর্ত্যবাবুর বিবেক জাগ্রত হয় না— দু-একটি বাক্যও খরচ করছেন বলে জানা যায়নি।

বস্তুত সেই কারণেই অমর্ত্য সেনের যাবতীয় কাজ উদ্দেশ্য- প্রণোদিত বলে মনে হয়। অমর্ত্যবাবু কিছু বললে মানুষ বুঝে নিতে চান যে আসল কারণটা কী? প্রতিভাবান হলেই বাণী বিতরণ করা যায় না। নিরপেক্ষতা এবং নিজের আচরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন তিনি যে-বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন, সে-বিষয়ে তিনি সৎ।

সম্প্রতি 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনিটিকে বঙ্গ সংস্কৃতি বিরোধী বিজাতীয় বলে মন্তব্য করেছেন অমর্ত্য সেন। ধ্বনিটি পূর্বে কম শোনা যেত, এখন বেশি শোনা যাচ্ছে ঠিক কথা। কিন্তু ধ্বনিটি বিজাতীয় হলো কীভাবে বোঝা গেল না। শব্দ তিনটির মধ্যে এমন কিছু নেই যা বঙ্গ সংস্কৃতির বিরোধী। বাংলার প্রাচীনতম গ্রন্থসমূহের অন্যতম কৃত্তিবাসী রামায়ণ কি তাহলে বঙ্গ সংস্কৃতির বিরোধী? কোনো নতুন বিষয় এলেই তা সংস্কৃতির বিরোধী হবে কেমন করে? সংস্কৃতি কী অচল-অটল-স্থানু কোনো বিষয়— প্রথমাবধি একই চেহারায় থেকে গেছে? নদীপ্রবাহের মতো সংস্কৃতি চতুর্দিক থেকে আহরণ করে, সঞ্চয় করে— চিরকাল করে আসছে। বঙ্গ সংস্কৃতি তার ব্যতিক্রম হবে কেমন করে?

অমর্ত্যবাবু উচ্চশিক্ষিত, কাজেই তিনি ইতিহাস-সচেতন নয়, এমন কথা অতি নিন্দুকও বলতে পারবেন না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''...আমাদের দেশে শিক্ষিত আর অশিক্ষিতের মধ্যে যে জ্ঞানের বৈষম্য সবচেয়ে বেশি করিয়া অনুভব করা যায়, তাহা ইতিহাস জ্ঞান।'' অমর্ত্যবাবুর মুশকিল হলো অমর্ত্যবাবু সম্ভবত তাঁর পূর্বগামী কয়েকটি যুগকেই ইতিহাসের সর্বস্ব বলে মেনে নিয়েছেন। তা না হলে নিশ্চয়ই নিজের কাছেই প্রশ্ন তুলতেন ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দিন বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক নদীয়া এবং লক্ষ্মণাবতী তথা গৌড় জয়ের পূর্বে বঙ্গদেশের কোথাও 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি শোনা গিয়েছে কি? দীর্ঘকাল পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি দাপিয়ে বেড়িয়েছে তা ১৯২০/২২-এর আগে ভারতবর্ষে শোনা গিয়েছে বলে মনে হয় না। কোনো কোনো লেখকের রচনায় খুঁজে পাওয়া গেলেও দেওয়ালে দেওয়ালে কমরেড শব্দটি অমর্ত্যবাবু তাঁর ছেলেবেলায় দেখেছেন কি?

বাঙ্গালির জীবনে কেন, প্রত্যেকটি জাতির জীবনেই নতুন নতুন বিষয় কালের প্রয়োজনে চলে আসে। কথাবার্তায় আসে নতুন নতুন শব্দ।

ইতালীয় রেনেসাঁর ইতিহাস প্রণেতা

Burkhart বিশ্বমানবের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন—"When the impulse to the highest individual development was combined with a powerful and varried nature, which has mastered all elments of colture of the age, then arose the all sided 'L'umo Universale.' সংক্ষেপে মর্মকথাটি এই যে প্রকৃত বিশ্বমানব তাঁকেই বলা হবে যিনি জগতের সকল সংস্কৃতিকেই আপন করে নিতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, "ভৌগোলিক বেষ্টন যতদিন সত্য ছিল ততদিন সেই বেষ্টনের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জাতির সকলের সঙ্গে মিলনে নিজেকে সত্য বলে অনুভব করেছে। আজ সেই ভূগোলের বেড়া ক্ষীণ হয়ে মানুষ পরস্পরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এত বড়ো সত্যটা আজও বাহিরের সত্য হয়েই রইল, মনের ভিতরে এ সত্য স্থান পেলেন।" অমর্ত্যবাবুর মনে যে স্থান পায়নি তা তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে।

অমর্ত্য সেন তো নিশ্চিতভাবেই একজন আন্তর্জাতিক মানুষ হিসেবে নিজের পরিচয় প্রদান করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন—নিজের দেশের উত্তর-অংশের সংস্কৃতিই তাঁর বিজাতীয় মনে হলো।

রবীন্দ্রনাথ কবিতায় 'ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলোনো'র কথা বলেছিলেন, অনেক তথাকথিত আন্তর্জাতিক মানুষের আন্তর্জাতিকতা কী সেইরকম? উল্লেখ্য অমর্ত্য সেনের মাতামহ ক্ষিতিমোহন সেন ছিলেন ভারতসংস্কৃতির একজন যথার্থ অনুরাগী। বঙ্গের মানুষের কাছে ভারতীয় সংস্কৃতির নানা বিষয় তুলে ধরেছেন ক্ষিতিমোহন সেন সারা জীবন ধরে। প্রমাণ করেছিলেন মানুষের সঙ্গে সংশ্রব আছে এমন কোনো কিছুই বিশেষ জাতির নয়, সমস্ত মানবজাতির।

অমর্ত্যবাবু 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনির সূত্রে মানুষ খুনের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। রাজনৈতিক সংঘর্ষে খুন-রক্তপাত বঙ্গে কয়েক দশককাল ধরেই সহজলভ্য—ইদানীং তো তা যথেষ্টই বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু উত্তেজনার মুহূর্তে খুন নয়, ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করে গাছে বা বিদ্যুতের খুঁটিতে ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে বিরুদ্ধ দলকে ভয় দেখাবার জন্য। সংঘর্ষে লিপ্ত রাজনৈতিক দলের সদস্যরা স্ব স্ব দলের প্রিয় ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে সময়ে সময়ে আঘাত করে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সদস্যের মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠেন না— এমন মিথ্যা বিশ্বাস কারো নেই।

কিন্তু কেউ যদি বলেন কোনো বিশেষ ধ্বনি, অমর্ত্যবাবুর কথা অনুযায়ী 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি তুলেই খুন করা হয়, এ-বিষয়ে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি প্রদানকারীরা একচেটিয়া, তাহলে সেই দাবি যিনি করেন তাকে মিথ্যাচারী বললেও কম বলা হয়। অমর্ত্যবাবু তেমন দাবিই করছেন, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

সম্প্রতি কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের সমালোচনা করেছেন অমর্ত্য সেন। বলেছেন সবকিছু নির্ভর করবে গণতন্ত্র ফিরে আসবে কিনা, তার উপর। সমালোচনাটি তাঁর ব্যক্তিগত প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিছু গণতন্ত্র ফিরে আসবে কিনা তার উপর সবটা নির্ভর করবে, এ কথা তো সবাই স্বীকার করবেন--- এতে নতুনত্বই বা কোথায়? অমর্ত্যবাবুর মুখে একথা সত্যজিৎ রায় পরিচালিত চলচ্চিত্র 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর মছলিবাবা চরিত্রটিকে মনে করিয়ে দেয়। মছলিবাবা আকাশের দিকে আঙুল তুলে বলছেন— 'এক সূর্য, এক চন্দ্র এবং ইত্যাদি', আর তা শুনে ভক্তবৃন্দ উচ্ছ্বসিত— যেন নতুন এক কথা শোনা গেল। অমর্ত্যবাবুর ভক্তবৃন্দও উচ্ছ্বসিত হবেন তাতে আর সন্দেহ কি?

কিন্তু এবিষয়ে একটি কথা বলবার অবকাশ থেকেই যায় যে, হাজার লোক ৩৭০ ধারা অপসারণকে সমর্থন করলেও মাত্র দশ-বিশজন লোক অস্ত্রহাতে তাণ্ডব-নৃত্য করলেই হাজার জনের মতামতকে পদদলিত করতে পারা যায়। প্রচার পাওয়া যায়। কারণ প্রচার করবার জন্য বুদ্ধিব্যবসায়ীরা তো রয়েইছেন, রয়েছে জে.এন.ইউ-র হিরের টুকরো কয়েকটি ছেলেও। সত্য কাশ্মীর সরকারের বড়ো চ্যালেঞ্জ--- ভারতীয় গণতন্ত্রের বড়ো পরীক্ষা, কিন্তু অমর্ত্যবাবু যাদের হয়ে ওকালতি করে থাকেন, সত্তর বছর ধরে পরীক্ষা করেও তারা সাফল্য পাননি বলেই তো নতুন করে পরীক্ষার অবকাশ তৈরি হয়েছে— এতবড়ো সত্যটিকে অমর্ত্যবাবু অস্বীকার করবেন কীভাবে? সাক্ষী তো একশো তিরিশ কোটি ভারতবাসী।

'অ্যালবার্ট পিন্টো কা গুস্সা কিউ আতা হ্যায়'--- এমন বাক্যবন্ধটির অনুকরণেই জানতে ইচ্ছা হয় অমর্ত্যবাবুর বিশেষ একটি দলের প্রতি ক্রোধের কারণ কী? কোনো এক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উচ্চপদকে জড়িয়ে নিন্দুকেরা অনেক কথা বলেন, যদিও তা সত্য কি না জানা নেই। সন্দেহ দেখা দেয় কারণ কোনো একটি রাজনৈতিক দলের সবই খারাপ হতে পারে এমন কথা সামান্যতম বিবেচক মানুষও মানতে পারেন না। তবে একথা সত্য যে অমর্ত্যবাবু মাঝে মাঝে রেগে যান এবং রেগে গেলে মানুষের 'দাঁত ফেলে দেবার' ইচ্ছাও তাঁর হয়। সেক্ষেত্রে কোনো দলের সম্পর্কে উদ্দেশ্য প্রণোদিত নিন্দা কিংবা বিষোদগার তো তুলনামূলকভাবে সামান্যই।

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৩ সেপ্টেম্বরের সংখ্যাটি পূজা সংখ্যা। তাই ২৩ সেপ্টেম্বর কোনো সাধারণ সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। ৩০ সেপ্টেম্বর সাধারণ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। পূজাবকাশের জন্য ৭ ও ১৪ অক্টোবর স্বস্তিকা প্রকাশিত হবে না। ২১ অক্টোবর থেকে যথারীতি স্বস্তিকা প্রকাশিত হবে।

পূজাবকাশের জন্য ৪ অক্টোবর থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত স্বস্তিকা কার্যালয় বন্ধ থাকবে।

***সম্পাদক, স্বস্তিকা***

# সন্ত্রাস দমনে সমবেত আন্তর্জাতিক প্রয়াস গ্রহণের আহ্বান প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত ষড়যন্ত্রকারীদের নিয়ন্ত্রণে এবং যারা সন্ত্রাসে মদত ও অর্থ জোগান দিয়ে জঙ্গিদের নিরাপদ আস্তানা করে দেয় তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের সওয়াল করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ সমবেত আন্তর্জাতিক প্রয়াস গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

কোরিয়া প্রজাতন্ত্র সফরকালে 'সিওল ডিফেন্স ডায়ালগ ২০১৯-এ মূল ভাষণ দিতে গিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, 'আজ সমগ্র বিশ্ব নিরাপত্তাগত যে অসংখ্য চালেঞ্জের সম্মুখীন, তার মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো সন্ত্রাসবাদ'। বিশ্বের কোনও দেশই সন্ত্রাসবাদের বিপদ থেকে মুক্ত নয়। ভারত, রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও অন্যান্য মঞ্চে সর্বদাই সন্ত্রাস দমনে দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক পর্যায়ে সহযোগিতা গড়ে তোলার ব্যাপারে সক্রিয় থেকেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বিশ্ব নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, ''আমাদের অঞ্চল সন্ত্রাসবাদ, দ্বন্দ্ব, সীমান্তপারের অপরাধ, নৌ-বাণিজ্যে হুমকি, জনসংখ্যার বৃদ্ধির মতো প্রচলিত ও অপ্রচলিত

সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে।'' এছাড়াও রয়েছে সুস্থায়ী উন্নয়ন, শক্তির অপ্রতুলতা, আন্তঃ-আঞ্চলিক বাণিজ্যে ঘাটতি ও সংযোগের অভাবের মতো সমস্যা। প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানান, 'প্রতিবেশী প্রথম' এই নীতির অঙ্গ হিসেবে ভারতের বিদেশ নীতিতে নিকট ও দূরবর্তী উভয় ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রতিবেশীরা সমান প্রাধান্য পেয়ে থাকে। কোরিয়া উপদ্বীপ অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় ভারতের সমর্থনের কথা প্রকাশ করে শ্রী সিংহ বলেন, ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার জন্য এক অভিন্ন আইনের শাসন-ভিত্তিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই অঞ্চলের সমস্ত দেশের সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সমতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে এ ধরনের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এমনকী, এ ধরনের ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সমস্ত দেশের সহমত থাকাও প্রয়োজন বলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অভিমত প্রকাশ করেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অচলে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক জোরদার করতে ভারতের প্রয়াসের কথা উল্লেখ করে বলেন, সমগ্র এশিয়া একবিংশ শতাব্দীকে শান্তি ও সার্বিক উন্নয়নের শতাব্দীতে পরিণত করতে পারে, যেখানে প্রতিটি দেশ দারিদ্র্য, রোগ, নিরক্ষরতা ও সন্ত্রাসবাদের মতো অভিন্ন চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করতে সক্ষম।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আরও বলেন, ভারতের 'পূর্বে তাকাও নীতি' এবং কোরিয়ার 'নতুন দক্ষিণাঞ্চলীয় নীতি'র মধ্যে যে সঙ্গতি গড়ে উঠেছে, তার ফলে দুই দেশের বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্ব অনেক মজবুত হয়েছে।

# ভারত-মার্কিন সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ অভ্যাস মহড়ার সূচনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর মধ্যে যৌথ

সেনা-মহড়া যুদ্ধ অভ্যাস ২০১৯-এর সম্প্রতি সূচনা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে জয়েন্ট বেস লিউই এমসি কর্ড-এ এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহড়ার সূচনা হয়। এই উপলক্ষ্যে দু'দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি, জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়। ভারত ও মার্কিন সেনা জওয়ানরা একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে দু' দেশের সেনাবাহিনীর পদস্থ আধিকারিকদের অভিবাদন জানান। এই মহড়ায় মার্কিন সেনাবাহিনীর ৫-২০ ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়নের একটি কোম্পানি এবং ভারতের অসম রেজিমেন্টের জওয়ানরা অংশ নিয়েছেন। মার্কিন সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল জেভিয়ার ব্রুনসেন ভারতীয় সেনা আধিকারিক ও জওয়ানদের স্বাগত জানান। এ প্রসঙ্গে মার্কিন সেনা আধিকারিক মেজর জেনারেল ব্রুনসেন বলেন, উভয় দেশের কাছেই গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, মমতা ও ন্যায়-বিচারের প্রতি আস্থা বজায় রাখার এক অভিন্ন মূল্যবোধ রয়েছে। মহড়ার অঙ্গ হিসাবে দুই দেশের সেনা জওয়ানরা একাধিক কৌশলগত যুদ্ধের পন্থা-পদ্ধতি বিষয়ে আদান-প্রদান করবে। পারস্পরিক স্বার্থে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে দু' দেশের বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন।

# একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে কেন্দ্রীয় সার দপ্তর স্থানীয়ভাবে তৈরি কাপড়/পাটের ওপর উৎসাহ দিচ্ছে

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে কেন্দ্রীয় সার দপ্তর সবরকম প্রয়াস চালাচ্ছে। তাই, একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করা হলে তার পরিবর্তে বাজারে বিকল্প ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিকল্প পথ হিসেবে স্থানীয়ভাবে তৈরি কাপড়/ পাটের ব্যাগ তৈরির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

এক্ষেত্রে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি কাপড়ের ব্যাগ তৈরি, সেলাই এবং বাজারজাত করার জন্য সহজেই প্রশিক্ষণ নিতে পারে।

এদিকে লক্ষ্য রেখেই কেন্দ্রীয় সার দপ্তর স্বচ্ছতা পক্ষকাল এবং 'স্বচ্ছতা হি সেবা' প্রচারাভিযানে কর্ণাটকের রামোহল্লি জেলার মারাগেন্ডানাহাল্লি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শ্রীলক্ষ্মী দেবী সহায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি কাপড়ের ব্যাগ কর্মীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। আশা করা হচ্ছে, এর ফলে কর্মীরা নিত্যদিন এই ধরনের কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহার করবে এবং একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার কমানোর ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেবে। একইসঙ্গে স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কাজ ও আয় বৃদ্ধি পাবে।

একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে সাধারণ মানুষকে তার বিকল্পের বিষয়ে সচেতন করে তোলা এবং গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে আয় বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সার দপ্তরের এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

# পরিবেশ-বান্ধব স্টেশনের লক্ষ্যে দক্ষিণপূর্ব রেলের উদ্যোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** দক্ষিণপূর্ব রেল ২১টি স্টেশনকে পরিবেশ-বান্ধব স্টেশন হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে। এর মধ্যে রাঁচি এবং দীঘা স্টেশনের কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। দুটি স্টেশনকেই পরিবেশগত দিক থেকে আইএসও ১৪০০১ : ২০১৫ শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, পুরুলিয়া, মেচেদা, সাঁতরাগাছি, বাগনান, পাঁশকুড়া, শালিমার, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, খড়্গপুর, আদ্রা, বালাশোর, হাতিয়া, টাটানগর, ঝাড়সুগুদা, রৌরকেল্লা, বোকারো স্টিল সিটি এবং চক্রধরপুর স্টেশনে প্রয়োজনীয় কাজ শুরু হয়ে গেছে।

পরিবেশ-বান্ধব স্টেশন গড়ার লক্ষ্যে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে :

• প্লাস্টিকের বোতলের পুনর্ব্যবহার বন্ধ করা এবং জঞ্জাল যাতে কম তৈরি হয় সেজন্য বিভিন্ন স্টেশনে বটল ক্রাশিং মেশিন বসানো হয়েছে।

• কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় জৈব এবং অজৈব জঞ্জালকে আলাদা করা হচ্ছে।

• নিকাশী জলকে পরিশোধনের জন্য স্টেশনগুলিতে এফলুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এবং সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট বসানো হচ্ছে।

• প্রচলিত শৌচাগারের বদলে পরিবেশ-বান্ধব অথবা গ্রিন টয়লেট বসানো হচ্ছে।

• রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতায় বনসৃজন এংব বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

• জল এবং বিদ্যুতের অপব্যবহার আটকাতে থার্ড পার্টি অডিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

• পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে দূষণকারীদের জরিমানা ধার্য করা হচ্ছে।

# মালদার সামসীতে দুই জেএমবি জঙ্গি গ্রেপ্তার

**সংবাদদাতা ॥** প্যাথলজিক্যাল ক্লিনিকের আড়ালে জেএমবি জঙ্গি সংগঠনের জাল বিছিয়েছে উত্তরবঙ্গ জুড়ে। সোমবার মালদা জেলার সামসী থেকে গ্রেপ্তার করা হয় দুই জঙ্গি আবদুল বারি (২৮), ও নিজামুদ্দিন খান (২৮)-কে। এই দুইজনের বাড়ি উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের প্রত্যন্ত গ্রামে। কলকাতা পুলিশের টাস্ক ফোর্সের গোয়েন্দারা ওই দুই জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় নিয়ে যায়। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি। শুরু হয়েছে তদন্ত। যদিও এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত জেলা পুলিশকর্তারা মুখ খুলতে রাজি হননি। সূত্রের খবর, ধৃত আবদুল বারি ও নিজামুদ্দিন খান উত্তর দিনাজপুরে জঙ্গি সংগঠনের দায়িত্বে ছিল। ওই এলাকার মুসলমান যুবক-যুবতীদের জেহাদি ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাদের নিয়োগ করা হয়েছিল। সেই কর্মকাণ্ডকে বাস্তবায়িত করতে একটি প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরির আড়ালে চলছিল জঙ্গি সংগঠনের কাজ। এলাকার মানুষজন কোনোভাবেই তাঁদের কর্মকাণ্ড টের পাননি। প্রসঙ্গত, মালদা ও উত্তর দিনাজপুরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সুযোগে জঙ্গি অনুপ্রবেশের ঘটনা অহরহ ঘটছে। এর আগে রতুয়া, কালিয়াচক এলাকায় হানা দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে একাধিক জঙ্গিকে। সেই জঙ্গি তালিকায় উঠে আসে মাসুদ আজাহার নামে এক সন্ত্রাসবাদীর নামও। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলো আবদুল বারি ও নিজামুদ্দিন শেখের নাম। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, পুলিশ ধৃতদের নিজেদের হেপাজতে নিয়ে কলকাতায় নিয়ে এসেছে। তাদেরকে কলকাতার আদালতে তুলে জেরা করার জন্য পুলিশি হেপাজতের আবেদন করবে। গোয়েন্দা সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, জেএমবি সংগঠনের সদস্য বাড়ানোর দায়িত্ব ছিল ওই দুই যুবকের। সেই উদ্দেশ্যেই ছদ্মবেশে, বিভিন্ন ব্যবসার আড়ালে গ্রামে গ্রামে ঘুরে এলাকাবাসীর সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াত নিজামুদ্দিন। সেই সঙ্গে কোয়াক ডাক্তারের কাজও করত সে।

*ধৃত দুই জেএমবি সদস্য।*

# সাত মাস আগেই উজ্জ্বলা যোজনায় ৮ কোটি রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঔরঙ্গাবাদে মহারাষ্ট্র রাজ্য গ্রামীণ জীবনজীবিকা মিশন আয়োজিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে নিজেদের আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করে তুলতে মহিলারা যেসব উদ্যোগ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তার প্রশংসা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঔরঙ্গাবাদ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি ঔরঙ্গাবাদ শহরের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠবে। অদূর ভবিষ্যতে এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি ভারতের অন্যতম শিল্পকেন্দ্রের রূপ নেবে। দিল্লি-মুম্বাই শিল্প করিডরের এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রয়েছে ঔরঙ্গাবাদ। এই শিল্প শহরে যে সংস্থাগুলি বিনিয়োগ করছে, তার ফলে প্রচুর কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হবে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ৮ কোটি রান্নার গ্যাসের সংযোগদানের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন এবং পাঁচজন সুফলভোগীর হাতে রান্নার গ্যাসের সংযোগ সংক্রান্ত নথিপত্র তুলে দেন শ্রী মোদী। নির্দিষ্ট সময়ের সাত মাস আগেই এই সাফল্য অর্জিত হওয়ায় সহকর্মীদের অবদানের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘রান্না ঘরের চুল্লী থেকে নির্গত ধোঁয়ায় মহিলাদের স্বাস্থ্যগত উদ্বেগের বিষয়গুলিকে বিবেচনায় রেখেই আমরা এই সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছি।’’ প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, যোজনার আওতায় কেবল গ্যাস সংযোগই দেওয়া হয়নি, সেইসঙ্গে গ্রামাঞ্চলে ১০ হাজার নতুন এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটারও নিয়োগ করা হয়েছে। নতুন বটলিং প্ল্যান্ট বা রান্নার গ্যাস ভরার ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। বন্দরগুলির কাছে গ্যাস টার্মিনালগুলির ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। পাইপলাইন নেটওয়ার্কের পরিধিও বাড়ানো হয়েছে। ৫ কেজি ওজনবিশিষ্ট গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। পাইপবাহিত গ্যাস সরবরাহও শুরু হয়েছে। ‘‘আমরা চাই একটি পরিবারও যাতে রান্নার গ্যাস সংযোগের সুবিধা থেকে বাদ না পড়ে।’’ প্রধানমন্ত্রী বলেন, দূরবর্তী স্থান থেকে জল সংগ্রহ করে নিয়ে আসার সময় মহিলাদের নিদারুণ কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে ‘জল জীবন মিশন’ শুরু হয়েছে। এই মিশনে জল সঞ্চয়ের পাশাপাশি বাড়িতে বাড়িতে জল সরবরাহ করার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সরকার আগামী পাঁচ বছরে এই কর্মসূচি খাতে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করবে।

# সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

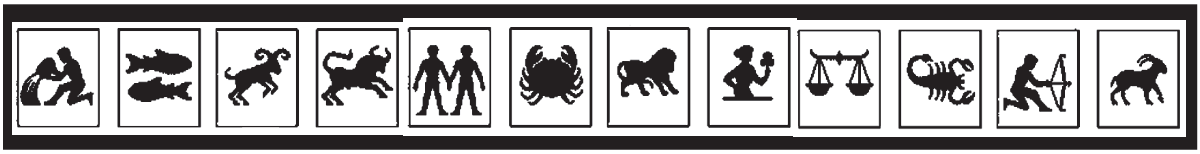

**১৬ সেপ্টেম্বর (সোমবার) থেকে ২২ সেপ্টেম্বর (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রাহু, সিংহে রবি, মঙ্গল, কন্যায় বুধ, শুক্র, বৃশ্চিকে বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী, শনি, কেতু। ১৯-০৯, বৃহস্পতিবার, শনি মার্গীরূপ পরিগ্রহ করছে। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মীনে রেবতি নক্ষত্র থেকে মিথুনে মৃগশিরা নক্ষত্রে।**

**মেষ :** পারিবারিক সুস্থিতি, চিন্তা চেতনায় দোমনাভাব, অপরিকল্পিত ব্যয়, আলটপকা মন্তব্য বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। রিসার্চ স্কলার, প্রযুক্তিবিদ, সি.এ. প্রতিষ্ঠানের প্রধানের বিদ্যার সঞ্চার, জ্ঞান পাণ্ডিত্যের ব্যাপ্তি কর্মপ্রার্থীর প্রতিষ্ঠা, পেশাদারের ক্রমবর্ধমান উন্নতি।

**বৃষ :** কর্মব্যস্ততা, মাতার স্বাস্থ্য ও পারিবারিক পরিস্থিতির পরিবর্তন, বন্ধুর ব্যবহারে অসংগতি, পরদুঃখকাতরতায় সমালোচনা ও ব্যয়াধিক্য যোগ। পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বিদ্যার্থীর সাফল্যের মাপকাঠি। সম্পত্তি বিষয়ক আইনি জটিলতা বুদ্ধিমত্তায় মোকাবিলা করুন। ক্রয়-বিক্রয় ও নতুন বিনিয়োগ স্থগিত রাখা শ্রেয়।

**মিথুন :** সন্তানের জন্য উদ্বেগ, অসুস্থতায় সঠিক চিকিৎসায় বিলম্ব, পরিচিত দ্বারা প্রতারণায় ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় দিন। কর্মস্থানে সচেতনতা সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা ও ব্যবসায় বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। গবেষণামূলক  কর্মে সাফল্য। স্ত্রীর পরামর্শ বৈষয়িক উন্নতির সহায়ক। সপ্তাহের শেষে হার্ট ও চক্ষুপীড়ার সম্ভাবনা।

**কর্কট :** কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা, চাপ, সাফল্য করায়ত্ত হয়ে হাতছাড়া হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখুন ও বিতর্কিত পরিবেশ এড়িয়ে চলুন। স্বজন সম্পর্কে উন্নতি সপরিবার ভ্রমণ ও নতুন উদ্যোগে বিনিয়োগ তবে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয়াধিক্য যোগ। ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির আপ্যায়ন, গুরুজনের পরামর্শে স্বাচ্ছন্দ্য ও নিকট ভ্রমণ।

**সিংহ :** শ্রদ্ধাবান, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য জ্ঞান আহরণ, মেধার বিকাশ, বহুমুখী কর্ম প্রয়াস, নীতি নিষ্ঠায় প্রকৃত সম্মান ও স্ত্রী-পুত্র সহ সুখী জীবন। ব্যবসায় নতুন উদ্যোগে নেতিবাচক ফল। অভিনয়, সংগীত, কাব্য ও কলাজগতের ব্যক্তিদের সৃজনশীলতা, লোকরঞ্জন, মান্যতা ও প্রশংসা।

**কন্যা :** আর্থিক লেনদেন, লিখিত চুক্তি, চলাফেরা এবং ছিদ্রান্বেষী বিষয়ে চোখ কান খোলা রাখতে হবে। জীবনসঙ্গীর দূরদর্শিতা, ব্যবসায় ধনলক্ষ্মীর কৃপাবর্ষণ, পেশাদারদের ব্যস্ততা বৃদ্ধি। সপ্তাহের প্রান্তভাগে রক্তাল্পতাজনিত কষ্ট ও অর্থহানি।

**তুলা :** কর্মে অতিরিক্ত দায়িত্ব। গৃহসংস্কার অথবা নব নির্মাণে বিলম্ব। গৃহের পরিবেশ ও মাতার স্বাস্থ্য বিষয়ক উদ্বেগ। সন্তানের মানসিক অস্থিরতা। আবেগ প্রবণতায় সময়ের সদ্ব্যবহারে অপরাগ। সপ্তাহের শেষভাগে ব্যক্তিত্বে ও বুদ্ধিমত্তায় দুরূহ কাজে বিজয়ীর সম্মান।

**বৃশ্চিক :** শরীরের নিম্নাঙ্গের চোট-আঘাত। ঋণবৃদ্ধি বিষয়ে সতর্ক থাকুন। কর্মপরিকল্পনার সফল রূপায়ণ। পদস্থ ব্যক্তির সহযোগিতা গবেষণা ও উচ্চশিক্ষায় সাফল্য ও বিকশিত অন্তর। অগ্রজের উন্নতি, বাধামুক্ত পরিবেশ। রমণীর স্নেহ সুধায় মনের প্রফুল্লতা ও আনন্দময়তার প্রকাশ।

**ধনু :** গৃহ ও মাতৃসুখ, বাড়ি, গাড়ি, বস্ত্র, অলংকার, সুখাদ্য ভোজনে আড়ম্বরপূর্ণতা জ্ঞানার্জন ও কর্মদক্ষতায় স্বীয় প্রতিভায় সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান ও শংসা। কর্মপ্রার্থীর আত্মপ্রতিষ্ঠায় হর্ষোৎফুল্ল চিত্ত তবে সন্তানের বদমেজাজ উদ্বেগের বিষয়।

**মকর :** আয়ের তুলনায় অধিক ব্যয়, পতি-পত্নীর শারীরিক অসুস্থতা, স্বীয় প্রতিভার বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা পবিত্র মনকে কলুষিত করবে। ব্যবসায় জটিলতা, সন্তানের বিধিবহির্ভূত পথে উপার্জনের ইঙ্গিত। রমণী সান্নিধ্যে নিন্দা। সম্মান ও সময়ের অপচয়।

**কুম্ভ :** প্রিয়জন ও প্রতিবেশীর অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্যে ব্যথিত। ব্যবসায় বিনিয়োগ, ভ্রমণ ও ক্রয়-বিক্রয় স্থগিত রাখা শ্রেয়। কয়লা, পেট্রোল, চর্ম, কাষ্ঠ ও পরিবহণ ব্যবসায় নতুন যোগাযোগে প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। বিশ্রামের পরিসরে আলস্য না আসে, অন্যথায় ভালো সুযোগ ও অর্থনাশের সম্ভাবনা।

**মীন :** দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি তবে স্বীয় আদর্শ, উর্বর চিন্তায় সহজ সরলীকরণ। সপ্তাহের প্রান্তভাগে গুরুজন সান্নিধ্যে হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল, কর্মক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতায় দক্ষতা ও শংসা। শরীরের মধ্যভাগে আঘাত, অপারেশন এবং হঠাৎ প্রাপ্তির যোগ।

• *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য

# স্বস্তিকা

## পূজা সংখ্যা : ১৪২৬

**আগামী সংখ্যায়ই পূজা সংখ্যা**

*পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা*

### দেবী প্রসঙ্গ

স্বামী ত্যাগীবরানন্দ, জয়ন্ত কুশারী

### উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত - চিহ্নায়ন ● রন্তিদেব সেনগুপ্ত - অভ্রকণা, অশ্রুকণাগুলি
প্রবাল চক্রবর্তী - মহিষাসুর নির্ণাশী ● জিষ্ণু বসু - লিপা

### বড়ো গল্প

সন্দীপ চক্রবর্তী - ধুলো

### গল্প

এষা দে, রমানাথ রায়, মালিনী চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ সিংহ,
গোপাল চক্রবর্তী

### ভ্রমণ

কুণাল চট্টোপাধ্যায়— বোহেমিয়া-বাভারিয়ার ভূখণ্ডে

### প্রবন্ধ

বিজয় আঢ্য, অচিন্ত্য বিশ্বাস, রঙ্গা হরি, অভিজিৎ দাশগুপ্ত, অর্ণব নাগ, জয়ন্ত ঘোষাল,
সুজিত রায়, সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম মুখোপাধ্যায়,
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপ বসু, কল্যাণ চৌবে।

**আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা**